৮

বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহ
Indigenous People in Bangladesh

বাংলাদেশে উপজাতীয় বা আদিবাসী নামে পরিচিত বেশ কিছু ক্ষুদ্র জাতিসত্তা রয়েছে যারা দীর্ঘকাল যাবত এ ভূখন্ডে বসবাস করে এসেছে। এদেশের ইতিহাসে বাঙালীদের পাশাপাশি গারো, সাঁওতাল, হাজং প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর সংগ্রামের ঐতিহ্য মিশে আছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষা তথা বাঙালী সংস্কৃতি এবং বাঙালী জাতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের পেছনে রয়েছে এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের পূর্বসূরীদের অনেকের ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও জাতিগত সংশ্লেষণ। তবে সমকালীন প্রেক্ষিতে গড়পড়তা শিক্ষিত বাঙালীদের দৃষ্টিকোণ থেকে এদেশের বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় ও তাদের সংস্কৃতিকে 'জাতীয় মূলধারা'র বাইরে বলেই গণ্য করা হয়।

আদিবাসীরা শুধুমাত্র তাদের সংখ্যাল্পতার কারণে এ ধরনের উপেক্ষিত অবস্থানে রয়ে গেছে, তা বলা যায় না। বরং কেন বা কোন্ প্রেক্ষিতে এদেশের কিছু ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী 'আদিবাসী' বা 'উপজাতীয়' নামে আখ্যায়িত হচ্ছে, এদেশের ইতিহাসে তাদের স্থান কি, এ ধরনের মৌলিক বিষয়ে সাধারণভাবে বিরাজ করছে অনেক অস্বচ্ছ ধারণা, বিভ্রান্তি বা অজ্ঞতা। সংখ্যায় কম হলেও এদেশেরই সন্তান এই আদিবাসীদের সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা শুধু তাদের পরিচয় বা বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্যই জরুরী না, বরং নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সংখ্যাগুরু বাঙালী জনগোষ্ঠীর ইতিহাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও তা একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ হওয়া দরকার।

এই ইউনিটে আপনি 'আদিবাসী' ও 'উপজাতীয়' পরিচিতির তাৎপর্য সম্পর্কে ধারণা পাবেন এবং এদেশে বসবাসরত আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের সংখ্যা, ভৌগোলিক অবস্থান এবং সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে সাধারণ পরিচিত লাভ করবেন। সেসাথে নির্বাচিত চারটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিচয়-- চাকমা, গারো, সাঁওতাল ও রাখাইন - আলাদা আলাদাভাবে তুলে ধরা হয়েছে এই ইউনিটে।

- ♦ পাঠ - ১ : বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের পরিচিতি
- ♦ পাঠ - ২ : চাকমা
- ♦ পাঠ - ৩ : গারো
- ♦ পাঠ - ৪ : সাঁওতাল
- ♦ পাঠ - ৫ : রাখাইন

পাঠ - ১

বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের পরিচিতি
Introduction to Indigenous People in Bangladesh

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- 'আদিবাসী' শব্দের সংজ্ঞা ও ব্যবহার
- বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের সংখ্যা ও ভৌগোলিক অবস্থান
- বাংলাদেশের আদিবাসীদের বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থার সাধারণ বিবরণ
- বাংলাদেশের আদিবাসীদের সাথে বাঙালী জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক সম্পর্ক

'আদিবাসী' পরিচয়ের তাৎপর্য

বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগ মানুষ বাঙালী হিসাবে পরিচিতি, তবে বাঙালীদের পাশাপাশি এদেশে বেশ কিছু ক্ষুদ্র জাতিসত্তারও (ethnic minority) বসবাস রয়েছে - যেমন চাকমা, গারো, সাঁওতাল প্রভৃতি - যারা সচরাচর উপজাতীয় বা আদিবাসী হিসাবে পরিচিত। এইসব জনগোষ্ঠীর পরিচয় সম্পর্কে সাধারণ কোন আলোচনায় যেতে হলে সর্বাগ্রে যে প্রশ্নটা চলে আসে তা হল, তাদেরকে উপজাতীয়, আদিবাসী বা অন্য কোন নামে অভিহিত করার তাৎপর্য কি? বাংলাদেশে 'উপজাতীয়' বা 'আদিবাসী' হিসাবে পরিচিত জনগোষ্ঠীরা বাঙালীদের তুলনায় সংখ্যায় খুবই অল্প, তবে সংখ্যাল্পতার কারণে যে তাদের ক্ষেত্রে এই পরিচয়গুলি ব্যবহার করা হয়, তা বলা যায় না। বাংলায় 'উপজাতি' শব্দটি ব্যবহার করা হয় ইংরেজী 'tribe'-এর প্রতিশব্দ হিসাবে। নৃবিজ্ঞানে 'tribe' ধারণা ব্যবহৃত হয় রাষ্ট্রের আবির্ভাব ও প্রসারের পূর্বে জ্ঞাতিসম্পর্কের ভিত্তিতে সংগঠিত বিশেষ ধরনের সমাজকে বোঝাতে।

বর্তমান বিশ্বে সকল জনগোষ্ঠীই কোন না কোন রাষ্ট্রের আওতায় বাস করে, কাজেই এই প্রেক্ষিতে উল্লিখিত বিশেষ অর্থে কোন জনগোষ্ঠীকে 'উপজাতীয়' হিসাবে চিহ্নিত করা সমস্যাজনক।

লক্ষ্যণীয় যে, বর্তমান বিশ্বে সকল জনগোষ্ঠীই কোন না কোন রাষ্ট্রের আওতায় বাস করে, কাজেই এই প্রেক্ষিতে উল্লিখিত বিশেষ অর্থে কোন জনগোষ্ঠীকে 'উপজাতীয়' হিসাবে চিহ্নিত করা সমস্যাজনক। কয়েক শতাব্দী আগে ইউরোপীয়রা তাদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যসমূহ বিস্তারের সময় পৃথিবীর অনেক অঞ্চলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ছিল যারা নিজেরা রাষ্ট্রীয়ভাবে সংগঠিত ছিল না বা রাষ্ট্রীয়ভাবে সংগঠিত বৃহত্তর কোন সমাজের অংশ ছিল না। এ ধরনের জনগোষ্ঠীই ঔপনিবেশিক সময়কাল থেকে 'উপজাতীয়' হিসাবে চিহ্নিত হয়ে এসেছে। তবে 'উপজাতীয়' হিসাবে চিহ্নিত সকল জনগোষ্ঠীই প্রকৃতপক্ষে প্রাক-রাষ্ট্রীয় স্তরের সমাজ ছিল কি না, এ নিয়ে খোদ নৃবিজ্ঞানেই বিতর্ক রয়েছে। অন্যদিকে ঔপনিবেশিক বা উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের আওতায় চলে আসার পরে এসব জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিতভাবে আর সে অর্থে 'উপজাতীয়' সমাজ বলা যায় না। এ ধরনের তাত্ত্বিক সমস্যার পাশাপাশি প্রচলিত ব্যবহারে 'উপজাতীয়' শব্দের নেতিবাচক ব্যঞ্জনাও তৈরী হয়েছে। 'উপজাতীয়' হিসাবে চিহ্নিত জনগোষ্ঠীদের সচরাচর 'আদিম' 'বর্বর' ইত্যাদি আখ্যায়ও ভূষিত করা হয়েছে। এসব কারণে 'উপজাতীয়' পরিচয়টা অনেকের কাছে এখন আর গ্রহণযোগ্য নয়, বিশেষ করে এই নামে পরিচিত মানুষদের কাছে।

বাংলায় অবশ্য আদিবাসী শব্দটিরও একই ধরনের নেতিবাচক ব্যঞ্জনা রয়েছে। তথাপি সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে ইংরেজী indigenous people-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'আদিবাসী' শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর একটা কারণ হল, 'উপজাতীয়' হিসাবে চিহ্নিত জনগোষ্ঠীদের পক্ষ থেকেই এই দাবী উঠেছে যে তাদেরকে 'আদিবাসী' (indigenous people) হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। এই দাবীর তাৎপর্য বুঝতে হলে আমাদের দেখতে হবে আন্তর্জাতিক পরিসরে indigenous people বলতে কি বোঝানো হচ্ছে। আভিধানিকভাবে 'indigenous' কথাটির অর্থ হচ্ছে স্থানীয়ভাবে উদ্ভূত। কোন বিশেষ অঞ্চলে বসবাসরত একাধিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ কোন জনগোষ্ঠীকে 'আদিবাসী' হিসাবে শনাক্ত

আভিধানিকভাবে 'indigenous' কথাটির অর্থ হচ্ছে স্থানীয়ভাবে উদ্ভূত। কোন বিশেষ অঞ্চলে বসবাসরত একাধিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ কোন জনগোষ্ঠীকে 'আদিবাসী' হিসাবে শনাক্ত করার অর্থ দাঁড়ায় এই, তারা জাতিগত ও সাংস্কৃতিকভাবে সেখানকার প্রাচীনতম অধিবাসীদের উত্তরসূরী।

করার অর্থ দাঁড়ায় এই, তারা জাতিগত ও সাংস্কৃতিকভাবে সেখানকার প্রাচীনতম অধিবাসীদের উত্তরসূরী। বলা বাহুল্য, এটি একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। অর্থাৎ স্থান ও কালের সীমানা কিভাবে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে, তার উপরই নির্ভর করছে কোন্ প্রেক্ষিতে কাদের আমরা 'আদিবাসী' বলতে পারি।

সাম্প্রতিককালে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে 'indigenous people'-এর ধারণা ব্যবহার করা হচ্ছে মূলতঃ বিগত পাঁচশ বছরের ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় নিয়েই। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের মত জায়গায় সেখানকার মূল অধিবাসীদের নিধন, উচ্ছেদ বা সাংস্কৃতিকভাবে ধ্বংস করে কিভাবে ইউরোপীয়রা এই ভূখন্ডগুলোর কর্তৃত্ব নিয়ে নিয়েছিল, সে ইতিহাস আপনার কমবেশী জানা আছে নিশ্চয়। এসব জায়গার আদি অধিবাসীদের উত্তরসূরী যেসব জনগোষ্ঠী স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রেখে টিকে আছে, তাদেরকে সাধারণভাবে বোঝানোর জন্যই সাম্প্রতিককালে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে 'indigenous people' ধারণার ব্যবহার শুরু হয়। এ ধরনের জনগোষ্ঠীদের ঐতিহাসিক বঞ্চনার প্রেক্ষিতে তাদের অনেক দাবীকে আইনগত অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগও জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় নেওয়া হয়েছে। এই প্রেক্ষিতেই বাংলাদেশে 'উপজাতীয়' হিসাবে অভিহিত জনগোষ্ঠীরা 'আদিবাসী' পরিচয়ের স্বীকৃতি চাচ্ছে।

বাংলাদেশসহ আফ্রিকা ও এশিয়ার অনেক দেশের সরকার অবশ্য নিজেদের দেশে বিশেষ কোন জনগোষ্ঠীকে indigenous people হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে আসছে। এর একটা কারণ হল, বর্তমানে সাধারণভাবে এসব দেশের ক্ষমতাসীন শ্রেণীর মানুষরাও নিজ নিজ দেশে দীর্ঘকাল যাবত বসবাসরত জনগোষ্ঠী থেকেই উদ্ভূত। একই দেশে দীর্ঘকাল যাবত বাস করে আসা জনগোষ্ঠীদের মধ্যে কারা সেদেশের আদি বাসিন্দাদের উত্তরসূরী আর কারা নয়, আক্ষরিক অর্থে তা নির্ধারণ করা অনেকক্ষেত্রেই অসম্ভব বা দুঃসাধ্য। তবে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল অনেক দেশেই আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছে 'জাতীয়তা'র বিশেষ কোন ধারণার ভিত্তিতে, যা অনেকক্ষেত্রে একই দেশের সকল জনগোষ্ঠীর পরিচয়কে সমানভাবে ধারণ করতে পারেনি। অধিকন্তু, ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হওয়া এসব নবীন রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণী ও সংখ্যাগুরু জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা নিজেরাই নিজ নিজ দেশের বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ অব্যাহত রেখেছে। কাজেই এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মত জায়গায়ও ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসনামল থেকে 'উপজাতীয়' বা অনুরূপ কোন বিশেষ পরিচয়ে পরিচিত হয়ে আসা বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে indigenous people হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের বিশেষ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা দরকার বলে অনেকে মনে করেন।

আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহৃত indigenous people-এর ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হওয়ার আগে থেকেই বাংলা ভাষায় 'আদিবাসী' শব্দটির চল ছিল।

উল্লেখ্য যে, আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহৃত Indigenous People-এর ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হওয়ার আগে থেকেই বাংলা ভাষায় 'আদিবাসী' শব্দটির চল ছিল। যেমন, পাকিস্তান আমলে লেখা আবদুস সাত্তারের 'আরণ্য জনপদে' নামক গ্রন্থে চাকমা, সাঁওতাল, গারো প্রভৃতি জনগোষ্ঠীকে 'আদিবাসী' হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে, যদিও 'আদিবাসীরা কেউ এদেশের ভূমিজ সন্তান নয়'--এ ধরনের বিভ্রান্তিকর বক্তব্যও একই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এসব ক্ষেত্রে 'আদিম' অর্থেই যে 'আদিবাসী' কথাটি ব্যবহৃত হয়, তা বলা বাহুল্য। তবে বাংলাদেশে 'আদিবাসী' বা 'উপজাতীয়' হিসাবে পরিচিত জনগোষ্ঠীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের মত দেশের এমন কিছু বিশেষ অঞ্চলে দীর্ঘকাল যাবত বাস করে আসছে যেসব জায়গায় বাঙালী জনবসতি গড়ে উঠেছে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে। এসব ক্ষেত্রে 'আদিবাসী'রা বৃহত্তর বাঙালী জনগোষ্ঠীর চাপের মুখে অনেক ক্ষেত্রেই বহুমাত্রিক অস্তিত্বের সংকটে নিপতিত হয়েছে, যে সংকট থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। এই প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিকভাবে indigenous people হিসাবে চিহ্নিত জনগোষ্ঠীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার যে প্রক্রিয়া চলছে, তাতে শামিল হওয়ার লক্ষ্যেই বাংলাদেশে 'আদিবাসী' শব্দটির পুরানো নেতিবাচক ব্যঞ্জনা সত্ত্বেও indigenous people এর সমার্থক হিসাবে এর ব্যাপক ব্যবহার শুরু করা হয়েছে। (বাংলাসহ উপমহাদেশের একাধিক ভাষায় 'আদিবাসী' শব্দটির প্রচলন শুরু হয়েছিল সম্ভবতঃ ইংরেজী

aboriginal-এর প্রতিশব্দ হিসাবে, যা ব্যুৎপত্তিগতভাবে indigenous-এর সমার্থক, তবে অপেক্ষাকৃত আগে থেকে প্রচলিত এই শব্দটি বর্তমানে প্রধানতঃ অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়।)

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, 'আদিবাসী' পরিচয়ের কোন সর্বজনস্বীকৃত বা সরকারী সংজ্ঞা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে নেই। সে যাই হোক, সাম্প্রতিককালে গড়ে ওঠা রেওয়াজ অনুসারে বাংলাদেশে 'উপজাতীয়', 'সংখ্যালঘু জাতিসত্তা' প্রভৃতি পরিচয়ে পরিচিত জনগোষ্ঠীদের সাধারণভাবে বোঝানোর জন্য এই ইউনিটে আমরা 'আদিবাসী' কথাটা ব্যবহার করছি।

বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের তালিকা, সংখ্যা ও ভৌগোলিক অবস্থান

বাংলাদেশে মোট কয়টি আদিবাসী জাতিসত্তা রয়েছে, তার কোন সুনির্দিষ্ট হিসাব পাওয়া যায় না। সরকারীভাবে অবশ্য 'আদিবাসী'র পরিবর্তে 'উপজাতীয়' পরিচয়ের আওতায় কিছু পরিসংখ্যান রয়েছে। যেমন, ১৯৯১ সালের আদমশুমারী প্রতিবেদনে ২৭টি 'উপজাতীয়' সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের মোট জনসংখ্যা হিসাব করা হয়েছিল ১২,০৫,৯৭৮। তবে উক্ত প্রতিবেদনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যে তালিকা দেওয়া রয়েছে, তা অসম্পূর্ণ এবং কিছু ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ। এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারী জরিপের ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে 'উপজাতীয়'দের মোট জনসংখ্যা সরকারী হিসাবের চাইতে বেশী হবে। আর সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন হিসাব মিলিয়ে দেখলে এটা প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে মোট ৪৫টির মত আদিবাসী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব থাকতে পারে। তবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত কোন জরিপ ছাড়া নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য, এ ধরনের কোন জরিপ চালানোর ক্ষেত্রে কোন জনগোষ্ঠীকে 'উপজাতীয়' বা 'আদিবাসী' হিসাবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে কি মাপকাঠি ব্যবহার করা হবে, তার উপর অনেকাংশে নির্ভর করবে জরিপের ফলাফল। এমন অনেক জনগোষ্ঠী আছে--যেমন, বর্মন, বেদে প্রভৃতি--যারা ক্ষেত্রবিশেষে বৃহত্তর বাঙালী সমাজের অংশ হিসাবে পরিচিত বা পরিচিত হতে আগ্রহী, আবার ক্ষেত্রবিশেষে তাদের আলাদা সম্প্রদায় হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে বা করা হয়ে থাকে। আবার এমনও দেখা গেছে যে, ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত দুটি জনগোষ্ঠীকে একটি বৃহত্তর সম্প্রদায়ের দুটি আলাদা ভাগ হিসাবে কেউ কেউ দেখছেন, আবার কেউ কেউ তাদেরকে আলাদা সম্প্রদায় হিসাবে চিহ্নিত করছেন। যেমন, পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক সময় তঞ্চঙ্গ্যাদের চাকমাদের একটি শাখা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে, তবে বর্তমানে তারা একটি আলাদা 'উপজাতি' হিসাবে সরকারীভাবে স্বীকৃত। স্পষ্টতই, বাংলাদেশে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংখ্যা কয়টি, তা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এ ধরনের বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে।

সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন হিসাব মিলিয়ে দেখলে এটা প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে মোট ৪৫টির মত আদিবাসী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব থাকতে পারে। তবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত কোন জরিপ ছাড়া নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তবে সাধারণভাবে অপেক্ষাকৃত প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতেই তাদের ঘনত্ব বেশী। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য পাহাড়ি এলাকা, গড়াঞ্চল, উপকুলীয় এলাকা ও উত্তরবঙ্গে আদিবাসীদের বসবাস রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বর্তমানে মোট ১১টি 'উপজাতীয়' জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব স্বীকৃত, যেগুলি হল (নামের আদ্যাক্ষরের ক্রমানুসারে), খিয়াং, খুমি, চাক, চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা, পাঙ্খো, বম, মারমা, ম্রো ও লুসাই। ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর অংশবিশেষ অবশ্য পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, চাঁদপুর, মৌলভীবাজার, রাজবাড়ি প্রভৃতি জেলায়ও রয়েছে। এরকম আরো কিছু জনগোষ্ঠী রয়েছে যাদের ভৌগোলিক বিস্তৃতি একাধিক বিভাগ জুড়ে রয়েছে। যেমন, রাখাইনদের বসবাস রয়েছে কক্সবাজার, বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলাসমূহে। গারো ও হাজংরা ঢাকা ও সিলেট বিভাগের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে আছে। গারো ও হাজংরা ছাড়াও ঢাকা বিভাগের ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও অন্যান্য জেলায় কোচ, ডালু, বর্মন (ক্ষত্রিয়), বানাই, রাজবংশী, হদি প্রভৃতি জনগোষ্ঠী, এবং সিলেট বিভাগে খাসিয়া, পাত্র, মণিপুরী প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। উত্তরবঙ্গে (রাজশাহী বিভাগ) উরাঁও, কোল, পাহাড়িয়া, মালো, মাহাতো, মাহালী, মুন্ডা, রাজবংশী, সাঁওতাল প্রভৃতি জনগোষ্ঠী রয়েছে।

বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তবে সাধারণভাবে অপেক্ষাকৃত প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতেই তাদের ঘনত্ব বেশী।

জনসংখ্যার বিচারে চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামের তো বটেই, সমগ্র বাংলাদেশেরও বৃহত্তম আদিবাসী জনগোষ্ঠী, ১৯৯১ সালের আদমশুমারীতে যাদের সংখ্যা ছিল আড়াই লক্ষের উপরে। উক্ত আদমশুমারী অনুযায়ী জনসংখ্যার দিক থেকে চাকমাদের পরেই রয়েছে যথাক্রমে সাঁওতাল (দুই লক্ষাধিক), মারমা (এক লক্ষ সাতান্ন হাজার), ত্রিপুরা (একাশি হাজারের উপরে), গারো (চৌষট্টি হাজারের উপরে), মণিপুরী (প্রায় পঁচিশ হাজার), ম্রো (বাইশ হাজারের উপরে, যারা 'মুরং' নামেও পরিচিত), তঞ্চঙ্গ্যা (প্রায় বাইশ হাজার), রাখাইন (সতের হাজার), কোচ (সাড়ে ষোল হাজার), বম (সাড়ে তের হাজার), খাসিয়া (বার হাজারের উপরে), হাজং (সড়ে এগার হাজার), উরাঁও (আট হাজারের উপরে) রাজবংশী (সাড়ে সাত হাজার), মাহাতো (সাড়ে তিন হাজার), পাঙ্খো (তিন হাজারের বেশী)। আদমশুমারীতে খিয়াং, চাক, মুন্ডা, খুমি, লুসাই প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর তালিকাও রয়েছে যাদের জনসংখ্যা দুই-আড়াই হাজারের মত বা আরো কম। এছাড়া 'বুনো' ও 'উরুয়া' নামে দুইটি জনগোষ্ঠীর উল্লেখও রয়েছে যাদের সম্পর্কে অন্যত্র তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ না করে 'অন্যান্য' হিসাবে আড়াই লাখের বেশী উপজাতীয়ের সংখ্যা দেখানো হয়েছে। এদের মধ্যে থাকতে পারে কোল, খন্ড, খারিয়া, ডালু, তুরী, পাহান, বানাই, সিং, পাত্র, বর্মন, বাগ্‌দি, বেদিয়া, মালো, মাহালি, মুরিয়ার, মুসহর, রাই, রাজুয়াড়, হদি, হো প্রভৃতি জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন বইপুস্তকে যাদের উল্লেখ রয়েছে, যদিও তাদের সকলের পরিচয় বা সংখ্যা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য তথ্য দুর্লভ।

ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি

বাংলাদেশের লিখিত ইতিহাসে এদেশের আদিবাসীদের প্রসঙ্গ তেমন একটা জায়গা পায়নি, যেটুকু পেয়েছে তাও অনেক ক্ষেত্রে ভ্রান্ত বা অস্পষ্ট ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। সামন্ত ও ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে এ অঞ্চলের আদিবাসীদের প্রতিরোধ ও সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও ব্যাপক সংখ্যক আদিবাসী সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল। কিন্তু এদেশের ইতিহাসকে যখন 'বাঙালীর হাজার বছরের ইতিহাসে'র আলোকে দেখা হয়, তখন সেখানে আদিবাসীরা আড়ালে চলে যায়। একইভাবে বাংলা ভাষা, বাঙালী সংস্কৃতি বা বাঙালী জনসমষ্টির অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে বর্তমান আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহের পূর্বসূরীদের কি অবদান ছিল, সে প্রসঙ্গ তেমন আলোচিত হয় না। সাধারণভাবে বলা যায়, গড়পড়তা শিক্ষিত বাঙালীদের দৃষ্টিকোণ থেকে আদিবাসীদের যে ভিন্নতাগুলো নজর কাড়ে - চেহারার পার্থক্য থেকে শুরু করে খাদ্যাভ্যাস ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য - সেগুলোর উল্লেখ পাঠ্যপুস্তকসহ বিভিন্ন বইপত্রে পাওয়া যায়, কিন্তু বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে বাঙালী ও আদিবাসীদের মধ্যেকার গভীরতর সম্পর্ক ও যোগসূত্রসমূহ দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়।

বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষাই বাংলা থেকে যথেষ্ট স্বতন্ত্র বলে বিবেচিত।... বাংলাদেশের আদিবাসীদের ভাষাসমূহকে চারটি ভাষাপরিবারে শ্রেণীভুক্ত করা যায়, সেগুলো হল: ইন্দো-ইউরোপীয় বা 'আর্য', দ্রাবিড়, অস্ট্রো-এশিয়াটিক ও তিব্বতী-বর্মী।

উদাহরণ হিসাবে এখানে ভাষার প্রসঙ্গ আলোচনা করা যেতে পারে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষাই বাংলা থেকে যথেষ্ট স্বতন্ত্র বলে বিবেচিত। শব্দভান্ডারের তুলনামূলক অধ্যয়নের ভিত্তিতে একই উৎস থেকে উদ্ভূত বলে বিবেচিত ভাষাসমূহকে একই 'ভাষা পরিবার'-এর অন্তভূর্ক্ত হিসাবে গণ্য করা হয়। সে হিসাবে বাংলাদেশের আদিবাসীদের ভাষাসমূহকে চারটি ভাষাপরিবারে শ্রেণীভুক্ত করা যায়, সেগুলো হল: ইন্দো-ইউরোপীয় বা 'আর্য', দ্রাবিড়, অস্ট্রো-এশিয়াটিক ও তিব্বতী-বর্মী। ১) আর্য: বাংলাসহ অহমিয়া, ওড়িয়া, হিন্দী প্রভৃতি ভাষাকে ইন্দো-ইউরোপীয় নামে পরিচিত ভাষা পরিবারের অন্তর্গত হিসাবে গণ্য করা হয়, যা 'আর্য' নামেও পরিচিত। বাংলাদেশের আদিবাসীদের মধ্যে চাকমা, হাজং প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর ভাষাসমূহকে 'আর্য' পরিবারের অন্তর্গত বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। ২) দ্রাবিড়: তামিল, মালয়ালম, তেলুগু প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাকে 'দ্রাবিড়' পরিবার-ভুক্ত হিসাবে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের মধ্যে ওরাঁও ও পাহাড়িয়াদের ভাষাসমূহ এই পরিবারের অন্তর্গত। উল্লেখ্য যে, ওরাঁও ও পাহাড়িয়ারা বাংলাদেশের ভূখন্ডে অভিবাসিত হয়েছিল ব্রিটিশ শাসনামলে, তার আগে এ অঞ্চলে দ্রাবিড়-ভাষী কোন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাসের প্রমাণ পাওয়া যায় না। ৩) অস্ট্রো-এশিয়াটিক: এই ভাষা পরিবারের দুইটি প্রধান শাখা হল 'মুন্ডা' ও

'মন-খ্মের'। মুন্ডা শাখায় মুন্ডাদের ভাষা মুন্ডারি ছাড়াও সাঁওতাল, মাহালী, হো প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর ভাষা অন্তর্গত। এ উপমহাদেশে 'মন-খ্মের' শাখার একমাত্র প্রতিনিধি হচ্ছে খাসিয়া ভাষা, যে শাখার আওতায় বার্মার মন্ ও কম্বোডিয়ার 'খ্মের' ভাষা অন্তর্গত। ৪) তিব্বতী-বর্মী: তিব্বতী ও বর্মী ভাষাসহ নেপাল, ভূটান ও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে প্রচলিত অধিকাংশ ভাষা এই পরিবারের অন্তর্গত। বাংলাদেশে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের বাকী সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীসহ গারো, রাখাইন, মণিপুরী (মেইতেই) প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর ভাষা এই পরিবারের অন্তর্গত।

'আর্য', 'দ্রাবিড়' প্রভৃতি শব্দকে নরবর্ণ ভিত্তিক বর্গ (racial category) হিসাবে দেখার প্রবণতা এককালে বেশ ব্যাপক ছিল। সে অনুযায়ী দ্রাবিড়, আর্য, অস্ট্রিক, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি নৃগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে বাঙালী জাতির উদ্ভব ঘটেছে, এ ধরনের বিভ্রান্তিকর ধারণা এখনো বেশ প্রচলিত। প্রকৃতপক্ষে, বাংলার প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে দ্রাবিড়-ভাষী কোন জনগোষ্ঠী ছিল, এমন কোন প্রমাণ নেই। বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় প্রভাব কিছু থাকলেও তা সংস্কৃত ভাষায় আত্মীকৃত দ্রাবিড় উপাদানের মাধ্যমেই এসেছে বলে ধারণা করা হয়। অন্যদিকে বাংলা অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীদের ভাষাসমূহ ছিল মূলতঃ মুন্ডা-গোত্রীয় অস্ট্রো-এশিয়াটিক বর্গের, এ ব্যাপারে ভাষাবিজ্ঞানীরা মোটামুটি নিশ্চিত। বাংলা ভাষায় যেসব 'দেশী' বা 'অনার্য' উপাদান রয়েছে, তার অধিকাংশ অস্ট্রো-এশিয়াটিক উৎসজাত বলে বিবেচিত। বাংলা ভাষায় লাঙল, কুড়ি, আন্ডা, পাড়া প্রভৃতি অজস্র 'দেশী' শব্দ রয়েছে যেগুলি মুন্ডা-গোত্রীয় ভাষা থেকে উদ্ভূত। এছাড়া বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও ব্যাকরণগত অনেক বৈশিষ্ট্যও অস্ট্রো-এশিয়াটিক উৎস থেকে এসেছে। এসব পর্যবেক্ষণ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে বাংলার প্রাচীন অধিবাসীদের মুন্ডা-গোত্রীয় ভাষার উপর 'আর্য' শব্দভান্ডার ও অন্যান্য উপাদান যুক্ত হয়ে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ঘটেছে। একইভাবে বাংলা ভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্করণে তিব্বতী-বর্মী প্রভাব (বিশেষ করে এই পরিবারের বোড়ো-গারো শাখার প্রভাব, যে শাখার আওতায় কোচ, গারো, ত্রিপুরা প্রভৃতি ভাষা অন্তর্ভুক্ত) লক্ষ্যণীয়। এদিক থেকে বিবেচনা করলে বাংলা ভাষার সাথে বাংলাদেশে বর্তমানে বসবাসরত আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের ভাষাসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক যোগসূত্র রয়েছে, যা আড়াল হয়ে যায় যখন আমরা বাংলাকে 'আর্য' এবং বেশীর ভাগ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষাকে 'অনার্য' অস্ট্রো-এশিয়াটিক বা তিব্বতী-বর্মী 'পরিবার'ভূক্ত হিসাবে দেখি।

বাংলা ভাষার সাথে বাংলাদেশে বর্তমানে বসবাসরত আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের ভাষাসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক যোগসূত্র রয়েছে, যা আড়াল হয়ে যায় যখন আমরা বাংলাকে 'আর্য' এবং বেশীর ভাগ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষাকে 'অনার্য' অস্ট্রো-এশিয়াটিক বা তিব্বতী-বর্মী 'পরিবার'ভূক্ত হিসাবে দেখি।

ভাষার ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি গ্রামীণ লোকজ সংস্কৃতির অনেক উপাদান ও বৈশিষ্ট্য তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে বাঙালী ও আদিবাসীরা অনেক ক্ষেত্রেই একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। কিন্তু বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতির ঐতিহাসিক বিকাশের ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে 'আদিবাসী' উপাদানসমূহকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করা হয়েছে। যেসব জনগোষ্ঠী বাঙালী হিন্দু বা মুসলমান সমাজে পুরোপুরি অঙ্গীভূত হয় নি বলে মনে করা হত, ব্রিটিশ শাসনামলে তারাই 'উপজাতীয়' হিসাবে আখ্যায়িত হয়েছিল। ব্রিটিশদের চোখে এই উপজাতীয়রা ছিল আদিম সংস্কৃতির ধারক-বাহক, যে দৃষ্টিভঙ্গী পরবর্তীকালে শিক্ষিত বাঙালীরাও অনেকাংশেই অনুসরণ করেছে। উচ্চবর্ণের বাঙালী হিন্দুরা যেমন অনেকেই কল্পিত আর্য অতীতে নিজেদের শেকড় খুঁজেছে, তেমনি বাঙালী মুসলমানদের উঠতি শ্রেণীগুলোও শেখ, সৈয়দ, মুগল বা পাঠান হিসাবে দেশীয় গন্ডীর বাইরে তাদের আত্মপরিচয়ের উৎস নির্ধারণ করেছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে। যেহেতু এদেশের আদিবাসীরা প্রায় সবাই ছিল অমুসলমান, পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে তাদের অবস্থান ছিল একেবারে প্রান্তিক। পরবর্তীতে বাঙালী জাতীয়তাবাদের উন্মেষের ফলে দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নূতন আলোয় দেখার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে বটে, কিন্তু সেক্ষেত্রেও জাতীয়তার পরিধি নির্ধারিত হয়েছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে আদিবাসীদের প্রান্তিক অবস্থানে রেখেই।

গ্রামীণ লোকজ সংস্কৃতির অনেক উপাদান ও বৈশিষ্ট্য তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে বাঙালী ও আদিবাসীরা অনেক ক্ষেত্রেই একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রান্তিকতার পাশাপাশি এদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীরা অর্থনৈতিকভাবেও প্রান্তিকীকরণের শিকার হয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে আদিবাসীরা ছিল ভূমির উপর

ঐতিহ্যগতভাবে আদিবাসীরা ছিল ভূমির উপর নির্ভরশীল। পাহাড়ি ও গড় এলাকার আদিবাসীরা মূলতঃ জুমচাষের উপর নির্ভরশীল ছিল, কিন্তু ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই এসব এলাকায় আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি অধিকার হরণের প্রক্রিয়া সূচিত হয়েছিল, যা পরবর্তীকালে আরো ত্বরান্বিত হয়েছে।

নির্ভরশীল। পাহাড়ি ও গড় এলাকার আদিবাসীরা মূলতঃ জুমচাষের উপর নির্ভরশীল ছিল, কিন্তু ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই এসব এলাকায় আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি অধিকার হরণের প্রক্রিয়া সূচিত হয়েছিল, যা পরবর্তীকালে আরো ত্বরান্বিত হয়েছে। এছাড়া আদিবাসী-অধ্যুষিত এলাকাগুলোয় অতীতে বাঙালী কৃষক জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি তেমন ছিল না, কিন্তু পাকিস্তান আমল থেকে দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে, ফলে যেসব এলাকায় আদিবাসীরা জুমচাষ ছেড়ে লাঙল ধরতে শুরু করেছিল, সাধারণভাবে তারা ক্রমবর্ধমান বাঙালী কৃষক জনগোষ্ঠীর চাপ মোকাবেলা করতে পারে নি। ক্রমসম্প্রসারমান বাজার-ব্যবস্থায়ও আদিবাসীদের সম্পৃক্ততা ছিল প্রান্তিক ভূমিকায়, কারণ এর নিয়ন্ত্রণ ছিল মূলতঃ বাঙালী ব্যবসায়ী শ্রেণীর হাতে। ফলে আদিবাসীদের একটা বড় অংশ জমি-জমার উপর তাদের প্রথাগত অধিকার হারিয়ে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের মত নূতন পেশায় আসতে না পেরে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়েছে।

আদিবাসীদের মধ্যে একটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও আবির্ভাব ঘটেছে... স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিন যাবত যে সশস্ত্র আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে, তাতে নেতৃত্ব দিয়েছিল মূলতঃ পাহাড়িদের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরাই।

অবশ্য আদিবাসীদের মধ্যে একটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও আবির্ভাব ঘটেছে, তবে এই শ্রেণীর বিকাশ সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমান হারে ঘটে নি। যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রতিক দশকগুলোতে চাকমাদের মধ্যে সাক্ষরতার হার এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, অন্যদিকে তাদের মধ্যে জুমচাষের উপর নির্ভরশীলতা ব্যাপকভাবে কমে গেছে। পক্ষান্তরে ম্রো জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের সংখ্যা এখনো হাতে গোণা রয়ে গেছে, এবং তাদের অধিকাংশই এখনো জুমচাষের উপর নির্ভরশীল। কাজেই এটা অপ্রত্যাশিত নয় যে, স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিন যাবত যে সশস্ত্র আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে, তাতে নেতৃত্ব দিয়েছিল মূলতঃ পাহাড়িদের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরাই। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর ২ তারিখে সম্পাদিত 'শান্তি চুক্তি'র আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে যে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়েছে, তাতে এই এলাকার আদিবাসীদের হারানো অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কিছুটা আশাবাদ সঞ্চারিত হয়েছে, তবে এই চুক্তি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলেও সকল শ্রেণী ও গোষ্ঠীর পাহাড়িরা সমভাবে উপকৃত হবে কি না, তা দেখার বিষয়। তাছাড়া 'শান্তি চুক্তি'র আওতায় আঞ্চলিক পরিষদ গঠনকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে একটি পদক্ষেপ হিসাবে গণ্য করা হলেও দেশের অন্যত্র যেসব আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে, তাদের জন্য অনুরূপ কোন ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত এদেশের আদিবাসীদের একটা বড় অংশ নিজেদের বঞ্চিত মনে করতে থাকবে। সবচেয়ে বড় কথা, এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিসত্তাসমূহের অস্তিত্ব সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত নয়। আদিবাসী নেতৃবৃন্দসহ অনেক বাঙালী বুদ্ধিজীবীও মনে করেন যে, সাংবিধানিক সুরক্ষা ছাড়া দেশের বিভিন্ন আদিবাসী জাতিসত্তার স্বতন্ত্র পরিচয় অক্ষুন্ন রেখে তাদেরকে জাতীয় মূলধারায় সম্পৃক্ত করা যাবে না।

উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, এদেশের আদিবাসীদের সাথে বাঙালী জনগোষ্ঠীর গভীর ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে, যা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত নয়। এদিক থেকে দেখলে রাষ্ট্রীয়ভাবে আদিবাসীদের পূর্ণ মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি শুধুমাত্র আদিবাসীদের স্বার্থের বিষয় নয়, বরং বাংলাদেশের সকল মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য এবং ঐতিহাসিকভাবে যথার্থ একটি জাতীয় পরিচয় নির্মাণের পথেও তা হবে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

সারাংশ

'আদিবাসী' পরিচয়ের কোন সর্বজনস্বীকৃত বা সরকারী সংজ্ঞা বাংলাদেশে নেই, তবে সাম্প্রতিককালে এদেশে 'উপজাতীয়', 'সংখ্যালঘু জাতিসত্তা' প্রভৃতি পরিচয়ে পরিচিত জনগোষ্ঠীদের সাধারণভাবে বোঝানোর জন্য 'আদিবাসী' কথাটা ব্যবহারের রেওয়াজ গড়ে উঠেছে। সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন হিসাব মিলিয়ে দেখলে এটা প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে মোট ৪৫টির মত আদিবাসী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব থাকতে পারে। বাংলা ভাষা তথা বাঙালী সংস্কৃতি এবং বাঙালী জাতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের

পেছনে রয়েছে এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের পূর্বসূরীদের অনেকের ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও জাতিগত সংশ্লেষণ। সামন্ত ও ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে এ অঞ্চলের আদিবাসীদের প্রতিরোধ ও সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও ব্যাপক সংখ্যক আদিবাসী সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল। এসব সত্ত্বেও অবশ্য বাংলাদেশের লিখিত ইতিহাসে এদেশের আদিবাসীদের প্রসঙ্গ তেমন একটা জায়গা পায় নি, যেটুকু পেয়েছে তাও অনেক ক্ষেত্রে ভ্রান্ত বা অস্পষ্ট ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রান্তিকতার পাশাপাশি এদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীরা অর্থনৈতিকভাবেও প্রান্তিকীকরণের শিকার হয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে আদিবাসীরা ছিল ভূমির উপর নির্ভরশীল, কিন্তু ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি অধিকার হরণের প্রক্রিয়া সূচিত হয়েছিল, যা পরবর্তীকালে আরো ত্বরান্বিত হয়েছে। আদিবাসীদের সম্পর্কে জানা এবং তাদের পূর্ণ মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি শুধুমাত্র তাদে স্বার্থের বিষয় নয়, বরং বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির গভীর মূল্যায়নের জন্যও তা অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন -

১। ১৯৯১ সালের আদমশুমারী প্রতিবেদনে কতটি "উপজাতীয়" সম্প্রদায়ের নাম উলে- খ করা হয়েছে ?

ক. ২৬টি　　খ. ২৭টি
গ. ২৮টি　　ঘ. ২৯টি

২। 'কোল' আদিবাসী জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের কোন অংশে বাস করে?

ক. পার্বত্য চট্টগ্রাম　　খ. সিলেট
গ. রাজশাহী　　ঘ. পটুয়াখালী

৩। ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম আদিবাসী জনগোষ্ঠী কোনটি ?

ক. ত্রিপুরা　　খ. সাঁওতাল
গ. মান্দি / গারো　　ঘ. রাখাইন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। নৃবিজ্ঞানে 'উপজাতি' শব্দটি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়?
২। 'আদিবাসী' ধারণা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিকতার ইতিহাস কীরাবে প্রাসঙ্গিক?
৩। বাংলাদেশের প্রধান আদিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহ কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। 'আদিবাসী' বলতে কী বোঝায়? বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এই অভিধা ব্যবহারের তাৎপর্য আলোচনা করুন।
২। বর্তমান প্রেক্ষিতে সংখ্যাগুরু বাঙালী জনগোষ্ঠীর প্রেক্ষিতে আদিবাসীরা প্রান্তিক অবস্থানে থাকলেও বাঙালী ও আদিবাসীদের মধ্যে রয়েছে গভীর ঐতিহাসিক সম্পর্কের যোগসূত্র - ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ - ২

চাকমা
The Chakmas

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- চাকমা জনগোষ্ঠীর সাধারণ পরিচিতি
- চাকমাদের ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা
- চাকমা ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু দিক
- চাকমাদের সমাজ কাঠামো

সাধারণ পরিচিতি

সাধারণভাবে 'পাহাড়ী' নামে পরিচিত যে ১১টি জাতিসত্তা পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করছে, তাদের মধ্যে চাকমারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সবচাইতে সুপরিচিত। অবশ্য আগেই যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছে, শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষিতে নয়, গোটা বাংলাদেশেই চাকমারা হল বৃহত্তম আদিবাসী সম্প্রদায়। তবে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে নয়, সাক্ষরতার ক্ষেত্রে অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের তুলনায় এগিয়ে থাকার কারণে চাকমাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বর্তমানে কর্মসূত্রে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে, এবং বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও অনেক চাকমা ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করছে, ফলে দেশে তাদের একটা সাধারণ পরিচিতি গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে দীর্ঘদিন যাবত পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বায়ত্ত্ব শাসনের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতি পরিচালিত সশস্ত্র সংগ্রামের সূত্রে আন্তর্জাতিকভাবেও চাকমারা বিশেষভাবে পরিচিতি পেয়েছে, যেহেতু পাহাড়ীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ তথা শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর জনগোষ্ঠী হিসাবে চাকমারাই এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল।

চাকমা জনগোষ্ঠীর বৃহত্তম অংশের বসবাস রয়েছে রাঙ্গামাটি জেলায়, এবং এরপর খাগড়াছড়িতে।... বর্তমানে বাংলাদেশের বাইরে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মিজোরাম, ত্রিপুরা ও অরুণাচল প্রদেশে অনেক চাকমা স্থায়ীভাবে বসবাস করছে, যাদের বড় অংশই কাপ্তাই বাঁধের ফলে স্থানচ্যুতিসহ বিভিন্ন কারণে পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ঐ সমস্ত অঞ্চলে অভিবাসিত হয়েছিল।

১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুসারে এদেশে চাকমা জনসংখ্যা ছিল আড়াই লক্ষাধিক। তবে সেসময় ভারতে আশ্রিত শরণার্থীরা যারা পরে দেশে ফিরে এসেছে তাদের হিসাব ও স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির মত বিষয় বিবেচনায় ধরলে এ সংখ্যা বর্তমানে আরো বেশী হবে। চাকমা জনগোষ্ঠীর বৃহত্তম অংশের বসবাস রয়েছে রাঙ্গামাটি জেলায়, এবং এরপর খাগড়াছড়িতে। বান্দরবান জেলায় চাকমাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে খুবই কম। বর্তমানে বাংলাদেশের বাইরে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মিজোরাম, ত্রিপুরা ও অরুণাচল প্রদেশে অনেক চাকমা স্থায়ীভাবে বসবাস করছে, যাদের বড় অংশই কাপ্তাই বাঁধের ফলে স্থানচ্যুতিসহ বিভিন্ন কারণে পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ঐ সমস্ত অঞ্চলে অভিবাসিত হয়েছিল।

ইতিহাস

চাকমাদের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে কয়েক শতাব্দী আগের প্রেক্ষিতে বিস্তারিত ও বস্তুনিষ্ঠ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। অবশ্য শুধু চাকমাদের বেলাতেই নয়, অন্যান্য প্রায় সকল আদিবাসী জাতিসত্তা, এমন কি খোদ বাঙালী জাতির ক্ষেত্রেই কথাটা অনেকখানি প্রযোজ্য। কারণ, প্রথাগত ইতিহাস চর্চায় বিভিন্ন রাজা-বাদশা বা অন্যান্য সামন্তপ্রভুদের কর্মকান্ডের প্রতি যতটা মনোযোগ দেখা গেছে, সে তুলনায় সামগ্রিকভাবে একটা জাতিসত্তা কিভাবে গঠিত হয়, এর বিকাশ বা ঐতিহাসিক রূপান্তর কিভাবে ঘটে, এ ধরনের বিষয়ে তেমন গবেষণা হয় নি। তার উপর একটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা হিসাবে অপরাপর আদিবাসী সম্প্রদায়সমূহের মতই চাকমারাও এদেশের মূলধারার ইতিহাস চর্চায় অনেকটাই উপেক্ষিত রয়ে গেছে। চাকমাদের সম্পর্কে যেসব ঐতিহাসিক তথ্য আমরা পাই, তার

অনেকটা মূলতঃ লিপিবদ্ধ হয়েছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের হাতে। অবশ্য সাম্প্রতিককালে শিক্ষিত চাকমাদের একটা অংশও নিজেদের ইতিহাস অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন, যাঁরা এই জাতির অতীত সম্পর্কে অজানা বা স্বল্প-জানা অনেক তথ্য, ধারণা বা তত্ত্ব হাজির করছেন, যদিও ক্ষেত্রবিশেষে ইতিহাসের সাথে কিংবদন্তী ও কল্পনার ভেদরেখা স্পষ্ট করা সম্ভব নয়। যাহোক, নীচে বিভিন্ন সূত্র অবলম্বনে চাকমা জাতির ইতিহাসের কিছু সাধারণ দিকের উপর আলোকপাত করা হল।

ঠিক কবে থেকে 'চাকমা' পরিচয়ধারী একটি জনগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে, এ বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য জানা যায় না, তবে মুগল শাসনামলে চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিশ্চিতভাবেই চাকমাদের বসবাস ছিল, এবং সেখানে তাদের আবির্ভাব আরো আগেই ঘটেছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। চাকমাদের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে চাকমাদের আদি বাসস্থান ছিল 'চম্পকনগর' নামক একটি স্থান, তবে এর সত্যতা বা সঠিক অবস্থান সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্যপ্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। চাকমাদের একাধিক পালাগানে বিজয়গিরি নামে এক রাজার যুদ্ধাভিযান, বিশেষ করে তাতে অংশগ্রহণকারী সেনাপতি রাধামন ও তার প্রেমিকা ধনপুদির কাহিনী বিবৃত রয়েছে। রাজা বিজয়গিরিকে চাকমা রাজাদের একজন আদিপুরুষ হিসাবে গণ্য করা হয়, তবে কিংবদন্তীর এই চরিত্র ও ঘটনাবলীর পেছনে কবেকার কোন্ ঐতিহাসিক সত্য লুকিয়ে আছে, তাও এখনো নিঃসংশয়ভাবে নিরূপিত হয় নি। অতীতে চাকমা রাজারা নিজেদের 'শাক্য-বংশীয়' (যে বংশে গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল) হিসাবে দাবী করতেন, তবে এই দাবীর সামাজিক ও প্রতীকী তাৎপর্য থাকলেও তার পেছনে কোন বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে, এমন প্রমাণ নেই।

চট্টগ্রামে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে এই অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে যে দুইটি রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ছিল, আরাকান ও ত্রিপুরা, তাদের উত্থান পতনের সাথে চাকমা জাতির ইতিহাস অনেকটা সম্পর্কিত ছিল বলে মনে করা হয়।

চট্টগ্রামে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে এই অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে যে দুইটি রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ছিল, আরাকান ও ত্রিপুরা, তাদের উত্থান পতনের সাথে চাকমা জাতির ইতিহাস অনেকটা সম্পর্কিত ছিল বলে মনে করা হয়। চাকমাদের একটা বড় অংশ একসময় আরাকান রাজ্যের প্রভাবাধীন চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল বাস করত বলে মনে হয়, তবে তার আগে তারা সেখানে উত্তর দিক থেকে গিয়ে থাকতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। বর্তমানেও আরাকানে 'দৈংনাক' নামে অভিহিত একটি জনগোষ্ঠী রয়েছে বলে জানা যায় যেটাকে তঞ্চঙ্গ্যা তথা চাকমাদের একটি বিচ্ছিন্ন অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়। (উল্লেখ্য, তঞ্চঙ্গ্যারা বর্তমানে একটি স্বতন্ত্র উপজাতি হিসাবে বিবেচিত হলেও তারা চাকমাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।) যাই হোক, ব্রিটিশ শাসনের প্রাক্কালে অর্থাৎ মোগল শাসনামলে চাকমাদের মূল আবাস ছিল চট্টগ্রাম অঞ্চলে। চাকমা রাজারা মোগল শাসকদের 'কার্পাস কর' দিত, এবং সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে তাদের অনেকে অভিজাত মুসলিম শাসকদের অনুকরণে 'খাঁ' পদবী সম্বলিত নাম ব্যবহার করতেন - যেমন, জল্লাল খাঁ, জান বক্স খাঁ প্রভৃতি। 'রাজা' হিসাবে অভিহিত হলেও তাঁরা অবশ্য পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কোন রাজ্যের অধিপতি ছিলেন বলে মনে হয় না, তবে চাকমা জনগোষ্ঠীর উপর তাঁদের কর্তৃত্ব ছিল এবং কখনো কখনো চাকমা রাজারা মোগল ও পরবর্তীতে ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৮৬০ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সৃষ্টির পর সেখানে যে তিনটি 'সার্কেল' চিহ্নিত করা হয়, তার একটি ছিল 'চাকমা সার্কেল'।

১৮৬০ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সৃষ্টির পর সেখানে যে তিনটি 'সার্কেল' চিহ্নিত করা হয়, তার একটি ছিল 'চাকমা সার্কেল' (যার সীমানায় বর্তমান রাঙ্গামাটি জেলার বেশীর ভাগ এলাকা এবং খাগড়াছড়ি জেলার কিয়দংশ অবস্থিত)। মূলতঃ চাকমা-অধ্যুষিত এই সার্কেলের চীফ পদটি স্বাভাবিকভাবেই চাকমা রাজ পরিবারের জন্য নির্ধারিত হয়। ব্রিটিশ শাসনের গোড়াতে চন্দ্রঘোনা ছিল জেলা সদর, তবে ১৮৬৮ সালে তা রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তরিত হয়, যে পদক্ষেপ চাকমা জনগোষ্ঠীর ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। রাজপরিবার সহ চাকমা জনগোষ্ঠীর মূল কেন্দ্র ছিল রাঙ্গামাটি, যেখানে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ঐতিহাসিকভাবে চাকমা সমাজে সাক্ষরতা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

ব্রিটিশ শাসনের শুরুতে অন্যান্য পাহাড়ী জনগোষ্ঠীদের মত চাকমারাও অর্থনৈতিকভাবে মূলতঃ জুমচাষের উপরই নির্ভর করত। তবে ব্রিটিশরা বিভিন্ন পন্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামে জুমচাষের পরিধি কমিয়ে তার পরিবর্তে লাঙল চাষের প্রসার ঘটানোর প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, যে পরিবর্তনে চাকমা জনগোষ্ঠীর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ শামিল হয়েছিল। বিশেষ করে রাঙ্গামাটিসহ কর্ণফুলী নদীর অববাহিকা বরাবর বেশ কিছু সমৃদ্ধ চাকমা জনপদ গড়ে উঠেছিল। তবে ১৯৬০-এর দশকে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে এই জনপদসমূহের অধিকাংশ হ্রদের নীচে তলিয়ে যায়, এবং এতে প্রায় এক লক্ষের মত যেসব মানুষ স্থানচ্যুত হয়েছিল, তাদের অধিকাংশ ছিল চাকমা সম্প্রদায়ভুক্ত। সেসময় স্থানচ্যুত চাকমাদের অনেকে বর্তমান খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন অংশসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য অঞ্চলে চলে যেতে বাধ্য হয়, এবং বাকীরা স্থায়ীভাবে দেশত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। উল্লেখ্য, এদের মধ্যে যারা ভারতীয় কতৃপক্ষ কর্তৃক অরুণাচল প্রদেশে পুনর্বাসিত হয়েছিল, তারা এখনো সেদেশের পূর্ণ নাগরিকত্ব পায়নি।

১৯৯৭ সালে 'শান্তি চুক্তি' সম্পন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত জনসংহতি সমিতি নামক একটি সংগঠনের নেতৃত্বে পাহাড়ীরা স্বাধিকারের দাবীতে দুই দশকের বেশী সময় ধরে যে সশস্ত্র আন্দোলন চালিয়েছিল, অনেক বিশ্লেষকের মতে তার একটি অন্যতম উৎস নিহিত রয়েছে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ঘটনায়। এই বাঁধের ফলে ব্যাপক স্থানচ্যুতির অভিজ্ঞতাসহ পাহাড়ীদের চোখে তাদেরকে নিজভূমে পরবাসী করার বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ তাদের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বিশেষভাবে বিচলিত করেছিল। পাহাড়ীদের মধ্যে এই শ্রেণীর বিকাশ সবচাইতে বেশী ঘটেছিল চাকমাদের মধ্যে, ফলে তাদের মধ্য থেকে গড়ে উঠেছে পাহাড়ীদের পরবর্তীকালের আন্দোলনের মূল স্রোত।

ভাষা ও সংস্কৃতি

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়ী জনগোষ্ঠীদের মধ্যে ভাষাগত দিক থেকে চাকমারা ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এই অর্থে যে, অন্য সকল গোষ্ঠীর ভাষাসমুহ 'তিব্বতী-বর্মী' (Tibeto-Burman) পরিবারভুক্ত হলেও চাকমা ভাষা বাংলার মতই 'ভারতীয়-ইউরোপীয়' (Indo-European) ভাষা পরিবারের অন্তর্গত

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়ী জনগোষ্ঠীদের মধ্যে ভাষাগত দিক থেকে চাকমারা ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এই অর্থে যে, অন্য সকল গোষ্ঠীর ভাষাসমুহ 'তিব্বতী-বর্মী' (Tibeto-Burman) পরিবারভুক্ত হলেও চাকমা ভাষা বাংলার মতই 'ভারতীয়-ইউরোপীয়' (Indo-European) ভাষা পরিবারের অন্তর্গত (একথা অবশ্য তঞ্চঙ্গ্যা ভাষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যার সাথে চাকমা ভাষার বড় কোন পার্থক্য নেই)। চাকমা ভাষার সাথে চট্টগ্রামী বাংলার যথেষ্ট মিল রয়েছে। তবে চাকমা ভাষাকে বাংলার একটি উপভাষা হিসাবে বিবেচনা না করে একটি স্বতন্ত্র ভাষা হিসাবেই গণ্য করা হয়। ধারণা করা হয়, একসময় চাকমাদের পূর্বসূরীদের ভাষাও তিব্বতী-বর্মী পরিবারভুক্ত ছিল, তবে কয়েক শতাব্দী আগে যে প্রক্রিয়ায় চট্টগ্রামী বাংলার বিকাশ ঘটেছিল, সেই একই প্রক্রিয়ায় সমান্তরালভাবে চাকমা ভাষারও আবির্ভাব ঘটে থাকতে পারে। ঐতিহ্যগতভাবে ধর্মীয় ও চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে চাকমা ভাষার একটা লিখিত রূপ প্রচলিত ছিল, যে কাজে ব্যবহৃত হরফ বর্মী বর্ণমালার অনুরূপ। বর্তমানে এই চাকমা বর্ণমালার কার্যকর কোন ব্যবহার নেই, যদিও চাকমা সমাজে অনেকে এটিকে নূতন করে চালু করার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করছেন। এমনিতে চাকমা ভাষায় যাঁরা সাহিত্য চর্চা করেন, তাঁরা মূলতঃ বাংলা হরফই ব্যবহার করেন। এখন পর্যন্ত চাকমা বা অন্য কোন পাহাড়ী ভাষা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্কুলে শেখানোর ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি, তবে অদূর ভবিষ্যতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের তত্ত্বাবধানে এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে।

চাকমা লোক-সংস্কৃতির অনেক উপাদানে জুমচাষ-নির্ভর জীবনযাত্রার প্রতিফলন দেখা যায়। বর্তমানে অবশ্য চাকমাদের খুব কম অংশই (এক চতুর্থাংশের নীচে) জুমচাষের উপর নির্ভর করে।

চাকমা লোক-সংস্কৃতির অনেক উপাদানে জুমচাষ-নির্ভর জীবনযাত্রার প্রতিফলন দেখা যায়। বর্তমানে অবশ্য চাকমাদের খুব কম অংশই (এক চতুর্থাংশের নীচে) জুমচাষের উপর নির্ভর করে। তথাপি শহুরে শিক্ষিত চাকমাদের শিল্প-সাহিত্য চর্চায় ফেলে আসা জুমিয়া জীবনের নান্দনিক উপস্থাপনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এই প্রেক্ষিতে চাকমা লোক-সংস্কৃতির অনেক উপাদান নূতন প্রেক্ষাপটে নূতন আঙ্গিকে শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনে অঙ্গীভূত হচ্ছে, যেমনটা অন্যান্য সমাজের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, এক সময় চাকমা নারীদের সাধারণ পোশাক ছিল ঘরে বোনা 'পিনন' (সেলাই বিহীন মোটা কাপড়ের পেটিকোট) ও 'খাদি' (বক্ষবন্ধনী), যে ধরনের পোষাক তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা প্রভৃতি অন্যান্য পাহাড়ী

সম্প্রদায়ও ব্যবহার করে। শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকমা নারীরা অনেকে প্রাত্যহিক ভিত্তিতে এই পোশাক আর ব্যবহার করে না, তথাপি দেখা যায় নিজেদের চাকমা তথা পাহাড়ী পরিচয়কে তুলে ধরার লক্ষ্যে তারা বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে পিনন-খাদি পরিধান করে, যদিও 'খাদি'র বর্তমান ব্যবহার অনেকটা ওড়নার সাথে তুলনীয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব পোশাক আর ঘরে নিজের হাতে বানানোও না, বরং বাণিজ্যিকভাবে বস্ত্রকলে উৎপাদিত পণ্য হিসাবে এগুলি বাজার থেকে কেনা। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, পিনন-খাদির উৎপাদন ও ব্যবহারের প্রেক্ষাপট পাল্টে গিয়ে এই পোশাক শহুরে প্রেক্ষাপটে নূতন তাৎপর্য নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছে।

চাকমা বর্ষপঞ্জীর সবচাইতে বড় উৎসবের নাম বিজু, যা চৈত্র্যের শেষ দুদিন ও বৈশাখের প্রথম দিন মিলে টানা তিন দিন ধরে চলে (মারমা ও ত্রিপুরারাও ভিন্ন নামে একই উৎসব পালন করে)। পুরানো বছরকে বিদায় দিয়ে নূতন বছরকে বরণ করা বিজু উৎসবের উপলক্ষ, তবে এর সামাজিক তাৎপর্য বাঙালী মুসলমানদের ঈদ বা বাঙালী হিন্দুদের শারদীয় দুর্গোৎসবের সাথে তুলনীয়। অতীতে কৃষি-নির্ভর গ্রামীন জীবনের ছন্দের সাথে তাল মিলিয়ে বিজু উৎসব পালিত হত। তবে শহুরে প্রেক্ষাপটে বিজু এখন আর শুধুমাত্র পানাহার, বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ানো, বা বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের সাথে সাক্ষাতের আনন্দ ইত্যাদির মধ্যে সীমিত নেই। সামাজিক মিলন বা পুনর্মিলনের একটি সময় ছাড়াও বিজু এখন চাকমা তথা পাহাড়ী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সচেতন অনুশীলন তথা পুনঃনির্মাণের একটা উপলক্ষও বটে।

চাকমা বর্ষপঞ্জীর সবচাইতে বড় উৎসবের নাম বিজু, যা চৈত্র্যের শেষ দুদিন ও বৈশাখের প্রথম দিন মিলে টানা তিন দিন ধরে চলে (মারমা ও ত্রিপুরারাও ভিন্ন নামে একই উৎসব পালন করে)।

ধর্মীয়ভাবে চাকমারা মূলতঃ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, তবে বহু প্রজন্ম ধরে বাহিত লোকায়ত বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের পাশাপাশি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তর সাংস্কৃতিক স্রোতধারাসমূহের বিভিন্ন প্রভাবও তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। লোকায়ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পাশাপাশি একসময় কালীপূজাসহ বিভিন্ন 'হিন্দু' আচার অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় বিশ্বাসের যথেষ্ট প্রভাব চাকমা সমাজে পড়েছিল, পরবর্তীতে বৌদ্ধ ধর্ম চাকমা সমাজে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে তা অনেকটা স্তিমিত হলেও পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। পক্ষান্তরে চাকমা রাজারা একসময় মুসলিম ধাঁচের নাম ব্যবহার করলেও ধর্মীয়ভাবে চাকমা সমাজে ইসলামের প্রত্যক্ষ বা ব্যাপক কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। অবশ্য চট্টগ্রামের বাঙালী মুসলমান জনসমষ্টির ঐতিহাসিক আবির্ভাবে অতীতে চাকমা তথা অন্যান্য পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর কিছু অংশ শামিল হয়ে থাকতে পারে, যদিও এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য নেই। বলা বাহুল্য, অন্য যে কোন জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির মতই চাকমা সংস্কৃতিও একটি বহমান ব্যবস্থা, যেখানে সময়ের পরিক্রমায় বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে চলছে যেগুলোর কোনটা ভেতর থেকে উৎসারিত, কোনটা বাইরে থেকে আসা।

ধর্মীয়ভাবে চাকমারা মূলতঃ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, তবে বহু প্রজন্ম ধরে বাহিত লোকায়ত বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের পাশাপাশি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তর সাংস্কৃতিক স্রোতধারাসমূহের বিভিন্ন প্রভাবও তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

সমাজ কাঠামো

চাকমা সমাজে ৪৬টি 'গঝা' বা গোত্র রয়েছে বলে জানা যায়, যেগুলির প্রতিটি আবার বিভিন্ন গুথি (গুষ্টি) বা উপগোত্রে বিভক্ত। (এই গোত্রগুলির মধ্যে একটির নাম হল 'লারমা', যেটি বিশেষভাবে পরিচিতি পেয়েছে জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও তাঁর অনুজ জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার নামের অংশ হিসাবে। উল্লেখ্য, নামের অংশ হিসাবে গোত্র উপাধি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত চাকমা সমাজে বিরল)। একসময় চাকমা সমাজে গোত্র সংগঠন বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তবে সমকালীন প্রেক্ষিতে এর গুরুত্ব অনেকটা কমে গেছে, অন্ততঃ শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকমাদের মধ্যে। বস্তুতঃ চাকমাসহ সকল পাহাড়ী জনগোষ্ঠী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে শাসন ব্যবস্থার অধীনে চলে আসার পর থেকে গোত্র-সংগঠনের রাজনৈতিক গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছিল, যে প্রক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ প্রাক-ব্রিটিশ আমলেই সূচিত হয়েছিল।

চাকমা সমাজে ৪৬টি 'গঝা' বা গোত্র রয়েছে বলে জানা যায়, যেগুলির প্রতিটি আবার বিভিন্ন গুথি (গুষ্টি) বা উপগোত্রে বিভক্ত।

প্রথাগতভাবে চাকমা জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটা সামাজিক ক্রমোচ্চবিন্যাস ছিল যার শীর্ষ বিন্দুতে অবস্থান করতেন চাকমা রাজা (বা রাণী)। মোগল বা ব্রিটিশ আমলে রাজ পরিবারের ঠিক পরেই যেসব চাকমা পরিবার সামাজিক-প্রশাসনিক কাঠামোয় সাধারণ প্রজাদের চাইতে উচ্চ অবস্থানে ছিল, তাদের

উত্তরসূরীরা এখনো বিভিন্ন সামন্তযুগীয় পদবী - দেওয়ান, তালুকদার, খীসা - ব্যবহার করে থাকেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ব্রিটিশ আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে যে তিনটি সার্কেলে ভাগ করা হয়েছিল, তার একটি ছিল 'চাকমা সার্কেল', যেখানে চাকমা জনগোষ্ঠী কেন্দ্রীভূত ছিল। চাকমা সার্কেলের চীফ পদটি ছিল চাকমা রাজাদের জন্য সংরক্ষিত। তবে ব্রিটিশ-পূর্ব যুগে চাকমা রাজাদের মর্যাদা যাই হয়ে থাকুক, অন্ততঃ ব্রিটিশ আমল থেকে 'চাকমা রাজা' পদটির অর্থ 'চাকমাদের রাজা' ছিল না, বরং তা ছিল 'চাকমা সার্কেলের চীফ বা রাজা'। এই ব্যবস্থা অনুসারে 'চাকমা সার্কেলে' বসবাসরত সকল পাহাড়ী সম্প্রদায়ের উপর কিছু ক্ষেত্রে চাকমা রাজার কর্তৃত্ব স্বীকৃত রয়েছে, পক্ষান্তরে যেসব চাকমা পরিবার অন্যান্য সার্কেলে বসবাস করে, তাদের ক্ষেত্রে অনুরূপ কোন কর্তৃত্ব প্রযোজ্য নয়।

সার্কেল চীফ বা রাজাদের কার্যাবলীর একটা ছিল নিজ নিজ সার্কেলের অধিবাসীদের কাছ থেকে রাজস্ব -বিশেষতঃ 'জুম কর'- আদায় করা। সে সাথে প্রথাগত সামাজিক বিচারকার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রেও সার্কেল প্রধানদের কর্তৃত্ব ছিল। প্রতিটা সার্কেল বিভক্ত রয়েছে অনেকগুলি মৌজায়। মৌজা প্রধান বা 'হেডম্যান'দেরও রাজস্ব আদায় ও সামাজিক বিচারকার্য পরিচালনায় ভূমিকা ছিল। প্রতিটা পাহাড়ী গ্রাম বা 'পাড়া'য় রাজা-হেডম্যানদের অনুমোদিত একজন করে গ্রাম প্রধান বা 'কার্বারী' রয়েছে। প্রতিটা জুমচাষী পরিবার থেকে একটা নির্দিষ্ট হারে জুম কর আদায় করা হত, যার ভাগ রাজা ও হেডম্যানরা পেতেন (কার্বারীরা এই ভাগ পেতেন না, তবে তাদের বেলায় 'জুম কর' মওকুফ ছিল)। ব্রিটিশ আমলের প্রেক্ষিতে রাজা ও হেডম্যানরা সংগৃহীত রাজস্বের যে ভাগ পেতেন, তার যথেষ্ট অর্থমূল্য ছিল, যার ভিত্তিতে চাকমাসহ সকল পাহাড়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট শ্রেণী বিভাজন গড়ে উঠেছিল।

বর্তমান প্রেক্ষিতে চাকমা তথা পাহাড়ী সমাজে কারো সামাজিক অবস্থান নিরূপণে পূর্বতন বংশমর্যাদা একমাত্র বা প্রধানতম মাপকাঠি নয়, বরং ব্যক্তির শিক্ষা, পেশা, বিত্ত ইত্যাদি বিষয়ের উপর তা অনেকখানি নির্ভর করে।

ব্রিটিশ আমলে পাহাড়ী সম্প্রদায়সমূহের জন্য যে 'প্রথাগত শাসনব্যবস্থা' প্রণীত হয়েছিল, তা কাগজে কলমে এখনো অনেকটা বহাল থাকলেও অনেক দিক থেকেই রাজা-হেডম্যান-কার্বারীদের কর্তৃত্বের পরিধি বা গুরুত্ব হ্রাস হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষিতে চাকমা তথা পাহাড়ী সমাজে কারো সামাজিক অবস্থান নিরূপণে পূর্বতন বংশমর্যাদা একমাত্র বা প্রধানতম মাপকাঠি নয়, বরং ব্যক্তির শিক্ষা, পেশা, বিত্ত ইত্যাদি বিষয়ের উপর তা অনেকখানি নির্ভর করে। এদিক থেকে চাকমা সমাজ কাঠামোর বর্তমান গতি-প্রকৃতি অন্যত্র বিদ্যমান সাধারণ প্রবণতা থেকে ভিন্ন নয়।

সারাংশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত চাকমারা বাংলাদেশের বৃহত্তম আদিবাসী সম্প্রদায়, যারা শিক্ষাদীক্ষায়ও বর্তমানে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর। বাংলাদেশের বাইরে ভারতের মিজোরাম, ত্রিপুরা ও অরুণাচল প্রদেশেও চাকমাদের বসবাস রয়েছে, যাদের অনেকে কাপ্তাই বাঁধের ফলে স্থানচ্যুত হয়ে অভিবাসী হয়েছিল। মুগল শাসনামল বা আরো আগে থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাকমাদের বসবাস ছিল, যেখানে কিংবদন্তী অনুসারে 'চম্পকনগর' নামক একটি স্থান থেকে তাদের আগমন ঘটেছিল। ব্রিটিশ শাসনের শুরুতে অন্যান্য পাহাড়ী জনগোষ্ঠীদের মত চাকমারাও অর্থনৈতিকভাবে মূলতঃ জুমচাষের উপরই নির্ভর করত। তবে ব্রিটিশ শাসনামলে চাকমাদের অনেকে লাঙল চাষের দিকে ঝুঁকে পড়ে, যাদের একটা বড় অংশ কাপ্তাই বাঁধের ফলে স্থানচ্যুত হয়েছিল। চাকমাদের বেশীরভাগ এখন আর জুমচাষ না করলেও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকমাদের সংস্কৃতি চেতনায় জুমিয়া ঐতিহ্যের গুরুত্ব রয়েছে। অন্য যে কোন সংস্কৃতির মত চাকমা সংস্কৃতিও পরিবর্তনশীল একটি ব্যবস্থা যেখানে বিভিন্ন ঐতিহ্যের সমন্বয় লক্ষ্যণীয়। চাকমা সমাজে বিভিন্ন গোত্র থাকলেও বর্তমানে গোত্র পরিচয়ের চাইতে শ্রেণীগত অবস্থানই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। আর বর্তমান চাকমা সমাজে ব্যক্তির শ্রেণীগত অবস্থান নিরূপণে সামন্ত বা ঔপনিবেশিক আমলের বংশমর্যাদার চাইতে শিক্ষা, পেশা, বিত্ত ইত্যাদির গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন -

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কতটি আদিবাসী জনগোষ্ঠী বসবাস করে?

ক. ১০টি　　খ. ১১টি
গ. ১২টি　　ঘ. ১৩টি

২। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সৃষ্টি হয় কত সালে ?

ক. ১৭৬০　　খ. ১৮৬০
গ. ১৯৬০　　ঘ. উপরের কোনটিই নয়

৩। 'বিজু' কোন জনগোষ্ঠি সবচেয়ে বড় উৎসব ?

ক. চাকমা　　খ. ত্রিপুরা
গ. মারমা　　ঘ. সাওতাল

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে ও দেশের বাইরে কোন্ কোন্ স্থানে চাকমা জনপদ রয়েছে?
২। চাকমাদের কাছে 'চম্পকনগর' নামক স্থানের তাৎপর্য কী?
৩। চাকমা জনগোষ্ঠীর উপর কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের প্রত্যক্ষ প্রভাব কি ছিল?
৪। 'বিজু' কী?
৫। 'চাকমা রাজা' কথার অর্থ 'চাকমাদের রাজা' নয় - কেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। চাকমা জনগোষ্ঠীর ইতিহাস আলোচনা করুন।
২। চাকমা জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি ও সমাজ কাঠামোর উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ তুলে ধরুন।

পাঠ - ৩

গারো / মান্দি
The Garos / Mandis

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- গারো জনগোষ্ঠীর সাধারণ পরিচিতি
- বাংলাদেশের গারোদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
- গারোদের 'মাতৃসূত্রীয়' জ্ঞাতি ব্যবস্থা
- গারোদের ভাষা, সংস্কৃতি ও আর্থসামাজিক অবস্থা

পরিচিতি

বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের মধ্যে গারোরা, অন্তত নামে, বেশ সুপরিচিত। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতায় সাঁওতাল, কোল আর ভিলের পাশাপাশি 'গারো' নামটি জুড়ে দিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ কবিতার মিলের খাতিরে 'গারো' নামটি ব্যবহার করা হয়ে থাকলেও সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষাপট থেকে এটা বোঝা যায় যে, যেসব আদিবাসী জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বাঙালি মানসে বিশেষ অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে, গারোরাও তাদের মধ্যে রয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীকেই নজরুল আক্রমণ করেছিলেন। ওই কবিতার বাণী ছিল, 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই'। যাহোক, যে বিষয়টা এখানে প্রাসঙ্গিক, তা হল, গারো নামে অভিহিত জনগোষ্ঠীর সদস্যরা নিজেরা নামটি পছন্দ করেন না। 'গারো' শব্দের সুনির্দিষ্ট কোন নেতিবাচক অর্থ না থাকলেও বাঙালীদের দৃষ্টিতে তথাকথিত 'আদিম' জনগোষ্ঠীদের তালিকায় এই নাম বেশ আগে থেকে অন্তর্ভুক্ত থাকার কারণেই হয়তবা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া নামটি নিয়ে বর্তমান প্রজন্মের গারোদের অনেকের আপত্তি। তাঁদের অনেকেই অধুনা নিজেদের 'মান্দি' নামেই পরিচয় দেন। আক্ষরিক অর্থে 'মান্দি' অর্থ 'মানুষ'। নিজেদের ভাষায় গারোরা নিজেদের অভিহিত করেন 'আচিক মান্দি' বা 'পাহাড়ের মানুষ' হিসাবে। সে সূত্রে সংক্ষেপে শুধু 'মান্দি' নামেই গারোদের আধুনিক পরিচিতি গড়ে উঠেছে।

নিজেদের ভাষায় গারোরা নিজেদের অভিহিত করেন 'আচিক মান্দি' বা 'পাহাড়ের মানুষ' হিসাবে। সে সূত্রে সংক্ষেপে শুধু 'মান্দি' নামেই গারোদের আধুনিক পরিচিতি গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশে বৃহত্তর ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল অঞ্চলে গারো বা মান্দি জনগোষ্ঠীর বসবাস। এছাড়া সিলেটসহ অন্যান্য জায়গায়ও কিছু সংখ্যক গারো রয়েছে। যেসব জেলায় গারো জনবসতি রয়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ঢাকা বিভাগের ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, শেরপুর ও নেত্রকোণা এবং সিলেট বিভাগের সিলেট, সুনামগঞ্জ ও মৌলভী বাজার। ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুসারে বাংলাদেশে গারো জনসংখ্যা ছিল চৌষট্টি হাজারের কিছু উপরে। তবে প্রকৃত সংখ্যা এক লক্ষের মত ছিল বলে গারোদের অনেকে মনে করেন এবং ওয়াকেবহাল গবেষকরাও সে অনুমান সমর্থন করেন। ভারতের মেঘালয় রাজ্যে গারো জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশের আবাস। ভৌগোলিক গুরুত্বের দিক থেকে মেঘালয়ের পূর্বাংশে অবস্থিত তুরা শহরকে গারো জনগোষ্ঠীর 'রাজধানী' হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। বাংলাদেশের গারোদের তুলনায় ভারতে বসবাসরত গারোরা শুধু সংখ্যায় বেশী তাই নয়, শিক্ষা দীক্ষায়ও তারা তুলনামূলক ভাবে এগিয়ে আছে। যেমন, ভারতীয় লোকসভার একজন স্পিকার পি. সাংমা ছিলেন একজন গারো। অবশ্য বাংলাদেশেও গারোদের মধ্য থেকে একজন সাংসদ হয়েছেন (প্রমোদ মানখিন, ১৯৯১-৯৬), এবং আশা করা যায় যে পরেও কেউ না কেউ হবেন। এদেশের গারোদের মধ্যে শিক্ষার হার একেবারে খারাপ নয়, অল্পসংখ্যক শিক্ষিত গারো ব্যক্তি বিভিন্ন মর্যাদাশীল পদেও কর্মরত রয়েছেন। তবে সার্বিকভাবে এদেশের গারো জনগোষ্ঠী বিভিন্ন প্রতিকূলতা ও আর্থসামাজিক সংকটের সাথে মোকাবেলা করেই টিকে আছে।

ইতিহাস

ত্রয়োদশ শতাব্দী নাগাদ গারো জনবসতি ঢাকা জেলার সাভার, ধামরাই, কালিয়াকৈর, শ্রীপুর; টাংগাইল জেলার বাসাইল, কালিহাতি, ঘাটাইল প্রভৃতি এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।

প্রায় এক হাজার বছর বা তারও আগে বর্তমান বাংলাদেশ ভূখন্ডে গারো পাহাড়ের পাদদেশে গারোদের পূর্বসূরীরা বসতি স্থাপন করতে শুরু করেছিল বলে অনুমান করা হয়। সুভাষ জেংচাম লিখিত 'বাংলাদেশের গারো সম্প্রদায়' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায়, নবম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে সুসং দুর্গাপুরে গারো রাজ্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, যেখানে গারো রাজা ও দলনেতাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দী নাগাদ গারো জনবসতি ঢাকা জেলার সাভার, ধামরাই, কালিয়াকৈর, শ্রীপুর; টাংগাইল জেলার বাসাইল, কালিহাতি, ঘাটাইল প্রভৃতি এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। তবে মোগল আমলে গারোদের পশ্চাদপসারণ শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনামলে তাদের ভৌগোলিক বিস্তৃতি আরো সংকুচিত হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ আমলে ঔপনিবেশিক শাসন ও জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে গারোরা প্রতিবেশী অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের সাথে মিলে বিক্ষিপ্তভাবে শতবর্ষ ধরে বিদ্রোহ ও সংগ্রাম চালিয়েছিল (১৭৭৫-১৮৮২)। গারোদের এই প্রতিরোধ ও সংগ্রামে প্রথমে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ছপাতি নকমা নামের একজন গ্রাম প্রধান। পরবর্তীতে এক পর্যায়ে শেরপুর অঞ্চলের করম শাহ্ নামক একজন ফকিরের প্রচারিত বাউল ধর্মমতও জমিদারদের শাসন-শোষণে পিষ্ট অনেক গারোদের সংগঠিত করতে সহায়তা করেছিল। ব্রিটিশ শাসকরা সামরিক অভিযান চালিয়ে, অত্যাচার নির্যাতনের মাধ্যমে, অন্যায় শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে গারোদের সশস্ত্র সংগ্রামকে দমন করেছিল, তবে তাদের মুক্তিকামী চেতনাকে চিরতরে ধ্বংস করতে পারে নি। তারই প্রমাণ আমরা পাই ১৯৭১ সালে সংঘটিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে, যে যুদ্ধে গারোরা ব্যাপক সংখ্যায় অংশ নিয়েছিল।

মাতৃসূত্রীয় জ্ঞাতি ব্যবস্থা

গারোদের একটি সামাজিক বৈশিষ্ট্য তাদেরকে অনন্যতা দিয়েছে, সেটা হল তাদের 'মাতৃসূত্রীয়' জ্ঞাতি ব্যবস্থা ।

গারোদের একটি সামাজিক বৈশিষ্ট্য তাদেরকে অনন্যতা দিয়েছে, সেটা হল তাদের 'মাতৃসূত্রীয়' জ্ঞাতি ব্যবস্থা (matrilineal kinship system)। বাংলাদেশে গারোরা ছাড়া একমাত্র খাসিয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনুরূপ ব্যবস্থা বিদ্যমান। গারোদের 'মাতৃসূত্রীয়' জ্ঞাতি ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়ার আগে এখানে প্রাসঙ্গিক একটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার। বইপত্রে গারো সমাজকে 'মাতৃতান্ত্রিক' হিসাবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। তবে মাতৃতন্ত্রের (matriarchy) ধারণা ব্যবহারে কিছুটা বিভ্রান্তির অবকাশ থেকে যায়, বিশেষ করে এটিকে পিতৃতন্ত্রের (patriarchy) বিপরীত হিসাবে গণ্য করা হলে। পিতৃতন্ত্র বলতে শুধু এটাই বোঝায় না যে সন্তানদের বংশ পরিচয় পিতার সূত্রে নির্ধারিত হয়, বরং পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পারিবারিক পরিসরে পিতার থাকে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব এবং সমাজে সাধারণভাবে নারীদের উপর পুরুষদের কর্তৃত্ব স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। ঠিক এর বিপরীত অবস্থা কোন সমাজে পরিলক্ষিত হয় নি যেখানে সমাজের সর্বস্তরে পুরুষদের উপর নারীরা কর্তৃত্ব করে। বরং 'যোদ্ধা', 'গ্রাম-প্রধান' প্রভৃতি ভূমিকায় পুরুষদেরই সচরাচর দেখা যায়। কাজেই এই সমস্ত বিষয় বিবেচনায় নিলে গারো বা অন্য কোন বিদ্যমান সমাজকে 'মাতৃতান্ত্রিক' হিসাবে অভিহিত করা যথার্থ নয়।

গারোদের মাতৃসূত্রীয় জ্ঞাতি ব্যবস্থার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত। প্রথাগতভাবে পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসাবে মেয়েদের মধ্যে একজনকে (সাধারণত সর্বকনিষ্ঠা কন্যা) নির্বাচিত করা হত, গারো ভাষায় যাকে 'নকনা' বলা হয়।

মাতৃসূত্রীয় বা মাতৃকুলক্রমিক জ্ঞাতি ব্যবস্থায় সন্তানদের বংশ পরিচয় নির্ধারিত হয় মায়ের সূত্রে। নামের শেষে 'সাংমা', 'রেমা', 'মানখিন', 'দ্রং' প্রভৃতি উপাধি প্রচলিত। এই উপাধিসমূহ মূলতঃ গোত্রবাচক। প্রথাগতভাবে গারোদের সকলের কাছে মাতৃকুলের পরিচয়টাই অগ্রগণ্য। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে একজন গারো নামের শেষে 'সাংমা' লিখবে, যদি তার মা 'সাংমা' হয়ে থাকে। গারো ভাষায় মাতৃকুলকে বলা হয় 'মাহারি'। জন্মের পর সন্তানরা মায়ের মাহারির সদস্য বলে গণ্য হয়। একই মাহারিতে বিয়ে নিষিদ্ধ। প্রথাগতভাবে গারো মেয়েরা বিয়ের পরে নিজের বাড়ি বা গ্রামেই বসবাস করত, তাদের স্বামীরা নিজ মাতৃকুল ও গ্রাম ছেড়ে স্ত্রীদের সাথে ঘর করতে আসত। এই প্রথা পালনের ব্যাপারে আধুনিক গারোদের অনেকের মধ্যে অনীহা লক্ষ্য করা গেলেও তা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। গারোদের মাতৃসূত্রীয় জ্ঞাতি ব্যবস্থার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত। প্রথাগতভাবে পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসাবে মেয়েদের মধ্যে একজনকে (সাধারণত সর্বকনিষ্ঠা কন্যা) নির্বাচিত করা হত, গারো ভাষায় যাকে 'নকনা' বলা হয়। তবে পারিবারিক সম্পত্তির উপর নকনার প্রথাগত অধিকারকে ঠিক 'ব্যক্তি মালিকানা' হিসাবে দেখা যায় না, বরং তাকে দেখা যায় সে সম্পত্তির

'হেফাজত-কারী' হিসাবে। যাহোক, এই প্রথার সুযোগ নিয়ে সংখ্যাগুরু বাঙালীদের কেউ কেউ গারো মেয়ে বিয়ে করে তাদের সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে, এমন তথ্য পাওয়া যায়। এ ধরনের সমস্যাসহ নূতন প্রজন্মের গারোদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের ফলে বর্তমানে 'নক্না' প্রথা কিছুটা শিথিল হয়েছে। তবে বিভিন্ন পরিবর্তন সত্ত্বেও গারো সমাজের মাতৃসূত্রীয় কাঠামো এখনো বহাল রয়েছে, এবং এই সমাজে নারীরা ঠিক পুরুষদের উপর কর্তৃত্ব না করলেও তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট মর্যাদা ও স্বাধীনতা ভোগ করে।

ভাষা, সংস্কৃতি ও আর্থসামাজিক অবস্থা

ভাষাবিজ্ঞানীদের শ্রেণীকরণ অনুসারে গারোদের ভাষা তিব্বতী-বর্মী (Tibeto-Burman) ভাষা পরিবারের 'বোড়ো-গারো' শাখার অন্তর্গত।

ভাষাবিজ্ঞানীদের শ্রেণীকরণ অনুসারে গারোদের ভাষা তিব্বতী-বর্মী (Tibeto-Burman) ভাষা পরিবারের 'বোড়ো-গারো' শাখার অন্তর্গত। কোচ, হাজং, রাজবংশী প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর আদি ভাষা থেকে শুরু করে বোড়ো, ত্রিপুরা প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর ভাষাও এই শাখার অন্তর্গত। বাংলাদেশের গারোরা এখনো তাদের মাতৃভাষা ধরে রেখেছে, যদিও এর চর্চা মূলতঃ কথ্যরূপেই সীমাবদ্ধ। অবশ্য এদেশে খুব সীমিত আকারে গারো ভাষার লিখিত চর্চাও রয়েছে, তবে এক্ষেত্রে যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার অভাবে অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মতই গারোরাও প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতার শিকার। অবশ্য সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত নেত্রকোণার বিরিশিরিস্থ 'উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী' এক্ষেত্রে কিছুটা ভূমিকা রাখছে। এছাড়া বহু বছর যাবত রেডিও বাংলাদেশের ঢাকা কেন্দ্র থেকে গারো ভাষায় 'সাল গিত্তাল' (নূতন সূর্য) নামক একটি অনুষ্ঠান নিয়মিত প্রচারিত হয়ে আসছে।

ঐতিহ্যগতভাবে গারোদের সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল কৃষি-নির্ভর গ্রামীণ জীবনযাত্রাকে ঘিরে।

ঐতিহ্যগতভাবে গারোদের সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল কৃষি-নির্ভর গ্রামীণ জীবনযাত্রাকে ঘিরে। শহুরে প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী অনুষ্ঠানে এই 'সনাতনী গারো সংস্কৃতি'র অনেক উপাদান এখনো নৃত্য-গীত-বাদ্য প্রভৃতির মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়। তবে এ ধরনের 'মঞ্চায়িত' সংস্কৃতি অনেকটাই খন্ডিত, মূল থেকে বিচ্ছিন্ন বা ক্ষেত্রবিশেষে সাম্প্রতিককালে উদ্ভাবিত। নৃবৈজ্ঞানিক অর্থে 'সংস্কৃতি' যে অনেক ব্যাপকতর বিষয়, দৈনন্দিন জীবনের অনুশীলনে নিহিত একটি জীবন্ত, চলমান ব্যবস্থা, এ উপলব্ধি আপনার নিশ্চয় হয়েছে। কাজেই কখনো যদি টিভিতে বা মঞ্চে গারোদের 'ঐতিহ্যবাহী কমলা-তোলা নাচ' জাতীয় কিছু দেখেন, তাহলে একটু তলিয়ে দেখবেন আদৌ সেটা 'ঐতিহ্যবাহী' কিছু কিনা, বা হয়ে থাকলেও কবে কিভাবে কাদের দ্বারা সেই ঐতিহ্যের চর্চা শুরু হয়েছে।

ব্রিটিশ আমল থেকে মিশনারীদের প্রচেষ্টার সূত্রে গারোদের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্ম যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে। বাংলাদেশের গারোদের মধ্যে অধিকাংশই বর্তমানে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। অল্পসংখ্যক যারা ধর্মান্তরিত না হয়ে পূর্বের বিভিন্ন বিশ্বাস ও আচার এখনো অনুসরণ করছে, গারোদের মধ্যে তারা 'সাংসারেক' নামে পরিচিত।

অন্যান্য জনগোষ্ঠীদের মধ্যে যেমন, তেমনি গারোদের মধ্যেও ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে চলছে। অর্থাৎ গারো সংস্কৃতিও স্থির, পরিবর্তনহীন কোন বিষয় নয়। গারোদের মধ্যে সংগটিত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মধ্যে ধর্মের প্রসঙ্গটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ব্রিটিশ আমল থেকে মিশনারীদের প্রচেষ্টার সূত্রে গারোদের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্ম যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে। বাংলাদেশের গারোদের মধ্যে অধিকাংশই বর্তমানে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। অল্পসংখ্যক যারা ধর্মান্তরিত না হয়ে পূর্বের বিভিন্ন বিশ্বাস ও আচার এখনো অনুসরণ করছে, গারোদের মধ্যে তারা 'সাংসারেক' নামে পরিচিত। অবশ্য যারা ধর্মান্তরিত হয়েছে, তারা যে সাংস্কৃতিকভাবে পুরোপুরি রূপান্তরিত হয়েছে, পূর্বের কোন আচার-বিশ্বাস ধরে রাখে নি, একথা বলা যায় না। যেমন, 'মাতৃসূত্রীয়' গোত্র ব্যবস্থার অনেক উপাদান সমকালীন খ্রিস্টান গারোরাও এখনো ধরে রেখেছে।

অতীতে গারোদের জীবিকার মূল উৎস ছিল জুমচাষ ও বনজ সম্পদ আহরণ, তবে বর্তমানে বাংলাদেশের গারোদের মধ্যে জুমচাষের প্রচলন নেই। জুমচাষের পরিবর্তে স্থায়ী চাষাবাদ, ফলের বাগান প্রভৃতির উপর অনেকে নির্ভর করে। তবে ঔপনিবেশিকতার ইতিহাসের জের ধরে গারো-অধ্যুষিত এলাকাসমূহের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এখন সরকারের বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন। এছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়ও গারোদের অনেকে ভূমি ও ভিটামাটি হারিয়েছে। ফলে গারোদের অনেকেই অর্থনৈতিকভাবে বেশ নাজুক অবস্থায় রয়েছে। অবশ্য তাদের মধ্যে সাক্ষরতার বেশ প্রসার ঘটেছে, এবং

সেসূত্রে অনেকে শহরাঞ্চলে, বিশেষ করে ঢাকায়, অভিবাসিত হচ্ছে। তবে অভিবাসী গারোদের অনেকেই মূলতঃ স্বল্প আয়ের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত - নার্স, গার্মেন্টস-কর্মী, উচ্চবিত্ত এলাকার গৃহ-কর্মী প্রভৃতি হিসাবে। অবশ্য উচ্চশিক্ষায় নিয়োজিত ছাত্রছাত্রী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত চাকুরিজীবীরাও কিছু রয়েছে এদের পাশাপাশি। এই অভিবাসিত গারোরা সামগ্রিকভাবে কতটা কিভাবে নূতন পরিবেশে নিজেদের মানিয়ে নিচ্ছে, তার উপর কিছুটা হলেও নির্ভর করবে গারো সমাজ ও সংস্কৃতির আগামী দিনের স্বরূপ।

সারাংশ

বৃহত্তর ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল অঞ্চলসহ আশে পাশের আরো কিছু এলাকা জুড়ে বাংলাদেশে আনুমানিক প্রায় এক লক্ষ গারো বসবাস করে। গারোরা নিজেদেরকে 'মান্দি' হিসাবে অভিহিত করতেই বেশী পছন্দ করে। বাংলাদেশ ভূখন্ডে গারোরা বহু শতাব্দী ধরে বাস করছে। ঔপনিবেশিক ও সামন্ত শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে তারা দীর্ঘকাল সংগ্রাম করেছে, তেমনি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধেও এদেশের গারোরা সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল। গারো সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে তাদের প্রথাগত মাতৃসূত্রীয় জ্ঞাতি ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থায় সন্তানরা মাতৃকুলের সদস্য বলে বিবেচিত হয় এবং মায়েদের গোত্র-পদবী ব্যবহার করে। এছাড়া গারো সমাজে প্রথাগতভাবে পুরুষরা বিয়ের পর স্ত্রীর পরিবারে বা স্ত্রীর গ্রামে নূতন বাসস্থানে থাকতে যেত, এবং পরিবারের সর্বকনিষ্ঠা কন্যা পারিবারিক সম্পত্তির মূল উত্তরাধিকারী হিসাবে গণ্য হত। তবে সময়ের প্রবাহের এসব প্রথাতে কিছু পরিবর্তন এসেছে। গারোদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে ব্রিটিশ আমল থেকে তাদের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মের ব্যাপক প্রসার। তাদের মধ্যে সাক্ষরতার হারও অনেক বেড়েছে, এবং কৃষি-নির্ভর গ্রামীণ জীবন ছেড়ে অনেকে শহরাঞ্চলে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন -

১। বাংলাদেশের কোন আদিবাসী জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে 'আচিক মান্দি' হিসেবে পরিচয় দেন ?

ক. চাকমা　　খ. গারো
গ. সাঁওতাল　　ঘ. রাখাইন

২। গারো ভাষায় মাতৃকুলকে কী বলা হয় ?

ক. সাংমা　　খ. মাহারী
গ. নক্না　　ঘ. উপরের কোনটিই নয়

৩। বাংলাদেশের গারোদের মধ্যে অধিকাংশই বর্তমানে ----- ধর্মাবলম্বী ?

ক. হিন্দু　　খ. ইসলাম
গ. বৌদ্ধ　　ঘ. খৃষ্টান

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের কোন্ কোন্ জেলায় গারো জনবসতি রয়েছে?
২। 'মান্দি' কথাটির অর্থ ও প্রয়োগ সম্পর্কে লিখুন।
৩। গারোদের 'মাতৃতান্ত্রিক' বলা সমস্যাজনক কেন?
৪। 'সাংসারেক' বলতে কী বোঝায়?
৫। 'নক্না' প্রথা কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। গারো জনগোষ্ঠীর পরিচয় ও ইতিহাস তুলে ধরুন।
২। গারো সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনশীল রূপের উপর আলোকপাত করুন।

পাঠ - ৪

সাঁওতাল
The Sautals

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর পরিচিতি
- বাঙালীদের সাথে সাঁওতালদের ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও জাতিগত যোগসূত্র সম্পর্কে গবেষকদের কিছু অভিমত
- ঔপনিবেশিক ও সামন্ত শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সাঁওতালদের রুখে দাঁড়ানোর ইতিহাস
- বাংলাদেশের সাঁওতালদের বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থার একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র

পরিচিতি

সাঁওতালদের সম্পর্কে আপনি কতটা জানেন, কিভাবে জানেন, একটু ভেবে দেখবেন কি? -- -- -- মাদলের তাল, বাঁশীর সুর ও হাড়িয়ার মাদকতা সহযোগে নৃত্যগীত-উৎসবে মেতে আছে নারী পুরুষ সকলে - সাঁওতাল জীবনের এরূপ চিত্রায়নের সাথে শিল্প, সাহিত্য, ছায়াছবি প্রভৃতির মাধ্যমে আপনি হয়তবা পরিচিত হয়ে থাকবেন। সাঁওতালরা দেখতে কেমন, এ সম্পর্কেও হয়ত বিভিন্ন সূত্রে আপনার একটা পূর্ব-ধারণা থাকতে পারে। সব মিলিয়ে বাংলা অঞ্চলের প্রধান একটি 'আদিম' জনগোষ্ঠী হিসাবে সাঁওতালদের সম্পর্কে বাঙালী জনমানসে বেশ কিছু বদ্ধমূল ধারণা রয়ে গেছে, যেগুলোর প্রধান দুটি দিক রয়েছে। একদিকে শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতে সাঁওতালদের একটা রোমান্টিক প্রতিচ্ছবি চোখে পড়ে, যেখানে তারা হয়ে দাঁড়ায় আদিম সারল্যের প্রতিমূর্তি, এবং কখনোবা সুদূর অতীতে ফেলে আসা বাঙালীদের কোন পূর্বতন সত্তা বা ঐতিহ্যের প্রতিচ্ছায়া; অন্যদিকে দৈনন্দিন জীবনে সাঁওতালদের অনেকে বাঙালীদের কাছে অচ্ছুৎ হিসাবেও গণ্য হয়ে এসেছে, যেমন উত্তরবঙ্গের অনেক স্থানে সাঁওতালদেরকে দোকানে চা খেতে দেওয়া হত না, এমন ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়, যে প্রবণতা এখনো পুরোপুরি ঘুচে যায়নি।

সরল ও আমোদপ্রিয় জনগোষ্ঠী হিসাবে সাঁওতালদের যে সাধারণ পরিচিতি রয়েছে, তার বাইরে এই উপমহাদেশের ইতিহাসে তাদের রয়েছে সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস।

সাধারণভাবে বলা চলে, সাঁওতালদের সম্পর্কে সংখ্যাগুরু বাঙালীদের অধিকাংশের ধারণা অস্পষ্ট, অনেকক্ষেত্রে কল্পনাশ্রয়ী, এবং সচরাচর অবজ্ঞাসূচক। একথা শুধু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেই সত্য তা নয়, বরং ভারতের পশ্চিম বঙ্গের বেলায়ও প্রযোজ্য, যেখানে অনেক বেশী সংখ্যায় সাঁওতালদের বসবাস রয়েছে। (ভারতে সাঁওতালদের মোট সংখ্যা অর্ধকোটির মত হতে পারে। বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক সংখ্যক সাঁওতালদের বসবাস। ছোট নাগপুর, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি হচ্ছে মূল সাঁওতাল-অধ্যুষিত এলাকা। এছাড়া উড়িষ্যা, আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি ভারতীয় অঙ্গরাজ্যে, এবং নেপালেও সাঁওতালদের বসবাস রয়েছে।) ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে দুই লক্ষাধিক সাঁওতাল রয়েছে, যাদের অধিকাংশ বাস করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় - যেমন, রাজশাহী, দিনাজপুর, নওগাঁ, বগুড়া, চাপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর, পঞ্চগড়, নাটোর, ঠাকুরগাঁও প্রভৃতি। অবশ্য উত্তরবঙ্গে দৈহিক বৈশিষ্ট্যে সাঁওতালদের সাথে মিল রয়েছে, এমন অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সদস্যদেরও (সংখ্যায় যারা ক্ষুদ্রতর) সাধারণভাবে সাঁওতাল বলেই মনে করা হয়। উত্তরবঙ্গের বাইরে সিলেটের চা বাগান এলাকায়ও সাঁওতালদের দেখা মেলে শ্রমিক হিসাবে। এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রামে খাগড়াছড়ি জেলার মত দূরবর্তী স্থানেও সাঁওতাল পল্লীর অস্তিত্ব রয়েছে।

সরল ও আমোদপ্রিয় জনগোষ্ঠী হিসাবে সাঁওতালদের যে সাধারণ পরিচিতি রয়েছে, তার বাইরে এই উপমহাদেশের ইতিহাসে তাদের রয়েছে সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। অধিকন্তু বাংলা ভাষা তথা বাঙালী জনসমষ্টির আবির্ভাবের ইতিহাস তলিয়ে দেখলেও সাঁওতাল ও সম্পর্কিত অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাথে সুদূর অতীতের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র আবিষ্কৃত হয়। কাজেই নীচে আমরা সেসব ইতিহাস সংক্ষেপে পর্যালোচনা করব।

ভাষা ও সংস্কৃতি: বাঙালীদের সাথে যোগসূত্র

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানীদের শ্রেণীকরণ অনুসারে সাঁওতালদের ভাষা অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা পরিবারের অন্তর্গত (Austro-Asiatic)।

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানীদের শ্রেণীকরণ অনুসারে সাঁওতালদের ভাষা অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা পরিবারের অন্তর্গত (Austro-Asiatic)। এই উপমহাদেশে এই ভাষা-পরিবারের দুটি শাখার প্রতিনিধি রয়েছে, একটি হল 'মুন্ডা' এবং অন্যটি হল 'মন-খ্মের' (Mon-Khmer)। মুন্ডা নামে একটি জনগোষ্ঠীও আছে, যাদের নামানুসারে প্রথমোক্ত শাখার নামকরণ করা হয়েছে, যদিও সংখ্যায় মুন্ডাদের চাইতে সাঁওতালরাই বেশী। 'মুন্ডা' ভাষাগোষ্ঠীর আওতায় সাঁওতাল ও মুন্ডা ছাড়াও কোল, হো, খেরওয়ারি, খারিয়া প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর ভাষা পড়ে। (অন্যদিকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বাইরে এই উপমহাদেশে মন্-খ্মের শাখার অন্তর্ভুক্ত একটি মাত্র ভাষার অস্তিত্ব রয়েছে--খাসিয়াদের ভাষা)। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানীরা ধারণা করেন যে, বাংলা ভাষার বিকাশ ও প্রসারের আগে এ অঞ্চলের আদি বাসিন্দাদের মধ্যে মুন্ডা গোষ্ঠীর ভাষাসমূহই সর্বাধিক প্রচলিত ছিল। বাঙালী জনগোষ্ঠীর একটা প্রধান অংশই জাতিগতভাবেও সেই উৎস থেকেই এসেছে বলেও ধারণা করা হয়। কালক্রমে সেই মুন্ডা-ভাষীদের অনেকে 'বাংলা' ভাষী তথা বাঙালী হয়ে উঠলেও বাংলা ভাষা বা বাঙালী সংস্কৃতিতে অস্ট্রো-এশিয়াটিক বহু ছাপ এখনো রয়ে গেছে। যেমন, বাংলা ব্যাকরণের বইয়ে 'দেশী' হিসাবে যেসব শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলির অধিকাংশ মুন্ডা-গোষ্ঠীর শব্দ। একইভাবে গ্রামাঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালীদের পালিত জন্ম-বিবাহ প্রভৃতি সংক্রান্ত অনেক লোকজ আচার-অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসও একই উৎসজাত বলে নৃবিজ্ঞানীরা রায় দিয়েছেন। তবে বাঙালী ভদ্রলোকেরা বেশীরভাগই নিজেদেরকে আর্য (হিন্দুদের বেলায়) বা শেখ-সৈয়দ-মুগল-পাঠানদের (মুসলমানের ক্ষেত্রে) বংশধর হিসাবেই কল্পনা করে আসছেন। কাজেই সাঁওতালদের মত আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের সাথে ঘনিষ্ঠ উৎপত্তিগত বা সাংস্কৃতিক যোগসূত্র থাকা সত্ত্বেও সামষ্টিকভাবে সমকালীন বাঙালীরা সেই যোগসূত্রকে বিস্মৃতির গহ্বরেই ফেলে রেখেছে।

বিদ্রোহ ও সংগ্রামের ইতিহাস

১৮৫৫-৫৬ সালের ইতিহাস-খ্যাত 'সাঁওতাল বিদ্রোহ', যেখানে সিদু ও কানু, নামের দুই ভাইয়ের নেতৃত্বে হাজার হাজার সাঁওতাল ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে নেমে পড়েছিল।

নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও আপেক্ষিক স্বাধীনতা বজায় রেখে সাঁওতালদের মত আদিবাসী জনগোষ্ঠীরা অপেক্ষাকৃত দুর্গম এলাকাসমূহে বসতি স্থাপন করে আসলেও বিভিন্ন সময়ে অধিকতর শক্তিশালী জনগোষ্ঠীদের আগ্রাসনের মোকাবেলা তাদের করতে হয়েছে। এই আগ্রাসন নূতন মাত্রা ও তীব্রতা লাভ করে উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর। ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থার আওতায় যখন সাঁওতাল তথা অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীরা ব্যাপক হারে শোষণ-নিপীড়নের মুখে পতিত হয়, তাদের অনেকে চেষ্টা করেছিল রুখে দাঁড়াতে। এভাবে সংঘটিত হয়েছিল ১৮৫৫-৫৬ সালের ইতিহাস-খ্যাত 'সাঁওতাল বিদ্রোহ', যেখানে সিদু ও কানু, নামের দুই ভাইয়ের নেতৃত্বে হাজার হাজার সাঁওতাল ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে নেমে পড়েছিল। বিহারের ভাগলপুর থেকে বীরভূম পর্যন্ত বিশাল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠী ও তাদের সহায়ক দেশীয় জমিদার-মহাজনদের শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল, কিন্তু সাঁওতালদের প্রতিরোধকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়া যায় নি। বাঙালী ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর যেসব সদস্যরা জমিদার-মহাজন বেশে সাঁওতাল-ভূমিতে আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল, তাদেরকে সাঁওতালরা অভিহিত করত 'ডিকু' হিসাবে। এই 'ডিকু'দের প্রতি সাঁওতালরা যে ঘৃণা ও অবিশ্বাস ঐতিহাসিকভাবে লালন করেছে, সেটাকে দেখা যেতে পারে ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের প্রতি তাদের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের হাতিয়ার হিসাবে।

১৯৪০-এর দশকে ইলা মিত্রের নেতৃত্বে রাজশাহীর নাচোলে সংঘটিত 'তেভাগা আন্দোলনে' সাঁওতাল বর্গাচাষীরাই নেতৃত্ব দিয়েছিল। এই আন্দোলন 'নাচোল বিপ্লব' বা 'রাজশাহীর/নাচোলের সাঁওতাল বিদ্রোহ' নামেও পরিচিত।

বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ তথা অন্যান্য অঞ্চলে যেসব সাঁওতালরা এখন রয়েছে, তারা মূলতঃ এসব এলাকায় অভিবাসিত হয়েছিল ব্রিটিশ শাসনামলে। ঐতিহ্যগতভাবে শিকার ও কৃষি-নির্ভর সাঁওতালরা এদেশের অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রথম জনবসতি গড়ে তুলেছিল। তবে এসব জায়গায়ও তারা সংখ্যাগুরুদের আগ্রাসন ও ক্ষমতাসীনদের শোষণ-নিপীড়ন থেকে রেহাই পায়নি। ১৯৪০-এর দশকে ইলা মিত্রের নেতৃত্বে রাজশাহীর নাচোলে সংঘটিত 'তেভাগা আন্দোলনে' সাঁওতাল বর্গাচাষীরাই নেতৃত্ব দিয়েছিল। এই আন্দোলন 'নাচোল বিপ্লব' বা 'রাজশাহীর/নাচোলের সাঁওতাল বিদ্রোহ' নামেও পরিচিত। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল জমির ফসলের ভাগাভাগিতে বর্গা-চাষীদের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করা। তবে রাষ্ট্রব্যবস্থা এগিয়ে এসেছিল জোতদারদের পক্ষে। ফলে সাঁওতাল বিদ্রোহীরা ব্যাপক নিপীড়নের শিকার হয়। বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান কৃষকরাও এই আন্দোলনে সমর্থন-সহায়তা জোগালেও দমনমূলক ব্যবস্থা

মূলতঃ সাঁওতালদের বিরুদ্ধেই গৃহীত হয়েছিল। দুঃখজনক হলেও সত্য, এ ধরনের বৈষম্য, অন্যায় ও নিপীড়ন-নির্যাতন থেকে এদেশের সাঁওতালরা এখনো মুক্ত হয় নি।

বাংলাদেশের সাঁওতালদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা

বাংলাদেশের সাঁওতালরা অধিকাংশই দরিদ্র এবং শিক্ষাবঞ্চিত। তাদের মধ্যে সাক্ষরতার হার সম্ভবতঃ ১০%-এর বেশী হবে না। তবে বিদ্যমান আর্থসামাজিক দুরবস্থা কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে সাঁওতাল ও তাদের প্রতিবেশী অন্যান্য আদিবাসীরা তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠিত হচ্ছে, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, বেসরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বর্তমানে 'সাঁওতাল স্কুল' পরিচালিত হচ্ছে, যে উদ্যোগের সাথে সাঁওতালরা নিজেরাও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অবশ্য মিশনারীদের থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ের একাধিক রাজনৈতিক দল ও বেশ কিছু বেসরকারী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ালেও 'ডিকু'দের প্রতি সাঁওতালদের ঐতিহ্যগত অবিশ্বাস কতটা ঘুচে গেছে, তা ততটা স্পষ্ট নয়।

নিজেদের জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশ থেকে ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকলেও এদেশের সাঁওতালরা যেসব বিভিন্নমুখী পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তা সম্ভবতঃ বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে একাধিক দেশে ছড়িয়ে থাকা সমগ্র সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর বেলায় কমবেশী প্রযোজ্য। যেমন, অর্থনৈতিকভাবে সাঁওতালরা এখন শিকারের উপর আদৌ বা তেমন নির্ভরশীল নয়, যদিও তীর-ধনুকের সাথে তাদের প্রতীকী সংশ্লিষ্টতা এখনো লক্ষ্য করা যায়। একইভাবে গোত্র-সংগঠন থেকে শুরু করে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানেও বিভিন্ন মাত্রায় পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগা স্বাভাবিক, যদিও বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দুর্লভ।

প্রথাগতভাবে সাঁওতাল সমাজে গ্রাম পঞ্চায়েতের অস্তিত্ব ছিল।

প্রথাগতভাবে সাঁওতাল সমাজে গ্রাম পঞ্চায়েতের অস্তিত্ব ছিল, যে ব্যবস্থায় 'মাঝি হাড়াম' (গ্রাম-প্রধান) থেকে শুরু করে বিভিন্ন পদ রয়েছে। এই ব্যবস্থা বর্তমানে কতটা কার্যকর রয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। সাঁওতালদের সামাজিক সংগঠনের অন্য একটি দিক হচ্ছে গোত্র-সংগঠন। এদেশে সাঁওতালদের বারটি গোত্র রয়েছে বলে জানা যায়, যেগুলির মধ্যে রয়েছে কিস্কু, হাসদা, মুর্মু, হেমব্রম, মারান্ডি, টুডু, সরেন, বাস্কি প্রভৃতি। উল্লেখ্য, এই গোত্র-উপাধিগুলোকে সাঁওতালদের নামের অংশ হিসাবে ব্যবহার করতে দেখা যায়। অবশ্য অবস্থাপন্ন সাঁওতালদের অনেকে বাঙালী হিন্দুদের পদবী তথা আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণ করেছে, এমন তথ্য পাওয়া যায়। অন্যদিকে সাঁওতালদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ খ্রিস্টান ধর্মও গ্রহণ করেছে, যদিও এক্ষেত্রে সাঁওতাল পদবী ত্যাগ করার দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে না। বলা বাহুল্য, নিজেদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার কতটা কিভাবে তারা ধরে রাখবে, বাইরের কতটুকু কি তারা গ্রহণ বা বর্জন করবে, এসব বিষয়ে ভেবে চিন্তে সাঁওতালরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবে। তারা সরল বা অজ্ঞ, এ ধরনের মূল্যায়নের ভিত্তিতে বাইরের কেউ যদি অভিভাবকসুলভ ভঙ্গীতে তাদের উপর কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে চায়, তবে এমন ব্যক্তি হয়ত 'ডিকু'র মতই আচরণ করবে। এ প্রসঙ্গে একটা কথাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়, অন্যান্য সকল জনগোষ্ঠীর মতই বাংলাদেশের সাঁওতালরাও পরিবর্তনশীল পরিপার্শ্বের সাথে খাপ খাইয়েই চলার চেষ্টা করবে। কাজেই 'সাঁওতাল' জনগোষ্ঠীর কথা শুনলেই স্থির-অনড় কিছু গতানুগতিক চিত্র যদি কারো মানসপটে ভেসে ওঠে, সেগুলো অবশ্যই ঝেড়ে ফেলা দরকার।

সারাংশ

সাঁওতালরা এ উপমহাদেশের অন্যতম একটি সংখ্যাবহুল আদিবাসী জনগোষ্ঠী, বাংলাদেশে যাদের একট ক্ষুদ্রাংশ মাত্র - সংখ্যায় দুই লক্ষাধিক - বসবাস করছে। বহু শতাব্দী ধরে জাতিগত বৈষম্য ও সামন্ত-ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই সাঁওতালরা তাদের আত্মপরিচয় সমুন্নত রেখেছে। অনেক গবেষকের মতে বাংলা ভাষা তথা বাঙালী জনগোষ্ঠী ও তাদের সংস্কৃতির উৎপত্তির ইতিহাসের সাথে সাঁওতালদের মত আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের পূর্বসূরীদের ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততা ছিল। উদাহরণস্বরূপ, বাংলা ভাষার 'দেশী' শব্দ ভান্ডার সেই সাক্ষ্যই দেয়। তবে সাধরাণভাবে বাঙালী ভদ্রলোকেরা তাদের জাত্যাভিমানের কারণে সাঁওতালদের সাথে তাদের এই 'আত্মীয়তা'কে রোমান্টিকতা বা অবজ্ঞা-উপেক্ষার আড়ালেই লুকিয়ে রেখেছে। অধিকন্তু ঐতিহাসিকভাবে তাদের অনেকে 'ডিকু'র ভূমিকায় সাঁওতালদের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার আগ্রাসনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তবে সাঁওতালরা নিজেরা এই আগ্রাসন বিনা বাধায় মেনে নেয় নি, বরং বিভিন্ন সময়ে তারা বিদ্রোহ ও সংগ্রাম করেছে শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশের সাঁওতালরা অধিকাংশই দরিদ্র ও শিক্ষাবঞ্চিত হলেও বিভিন্নভাবে তারাও প্রতিকূল পরিবেশের খাপ খাইয়ে চলার চেষ্টা করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন -

১। 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' কত সালে সংঘঠিত হয় ?

ক. ১৮৫৪-৫৫ খ. ১৮৫৫-৫৬
গ. ১৮৫৬-৫৭ ঘ. ১৮৫৭-৫৮

২। সাঁওতাল সমাজে গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় শীর্ষ পদ বা গ্রাম প্রধানকে কি বলা হয় ?

ক. মাঝি হাড়াম খ. ডিকু
গ. হাসদা ঘ. সরেন

৩। সাঁওতাল সমাজে মোট কতটি গোত্র রয়েছে ?

ক. ৯টি খ. ১০টি
গ. ১১টি ঘ. ১২টি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ভারত ও বাংলাদেশের কোন্ কোন্ অঞ্চলে সাঁওতালরা বাস করে?
২। 'মুন্ডা ভাষা-গোষ্ঠী' কি এবং এর সাথে সাঁওতাল ভাষার সম্পর্কীক?
৩। সিদু ও কানু কারা ছিলেন?
৪। 'ডিকু' মানে কী?
৫। 'নাচোল বিপ্লব' কী ছিল?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সাঁওতালদের সম্পর্কে বাঙালী সমাজে কী ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করে? এই দৃষ্টিভঙ্গীর মূল্যায়ন করুন।
২। বৃহত্তর পরিপার্শ্বের সাথে সাঁওতালরা কতটা কিভাবে মানিয়ে চলেছে, ইতিহাসের আলোকে তুলে ধরুন।

পাঠ - ৫

রাখাইন
The Rakhains

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- এদেশে রাখাইন জনগোষ্ঠীর অবস্থান ও পরিচয়
- রাখাইনদের ইতিহাস
- রাখাইনদের আর্থসামাজিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সাধারণ পরিচিতি

রাখাইনরা হচ্ছে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসরত একটি জনগোষ্ঠী। পটুয়াখালী, বরগুনা ও কক্সবাজার জেলাসমূহে রাখাইন জনপদ রয়েছে। কক্সবাজার জেলায় সদর এলাকা ছাড়া মহেশখালী, রামু, টেকনাফ প্রভৃতি অঞ্চলে তাদের বসতি রয়েছে। রাখাইনদের কিছু অংশ বান্দরবানেও দেখা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামে 'মারমা' নামে পরিচিত জনগোষ্ঠীর সাথে রাখাইনদের ঘনিষ্ঠ ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক মিল তথা ঐতিহাসিক যোগসূত্র রয়েছে। বাস্তবে অবশ্য মারমা ও রাখাইনরা আলাদা দুটি সম্প্রদায় হিসাবেই বিবেচিত হয়, যদিও এই বিভাজনের কারণ ভৌগোলিক দূরত্ব নাকি অন্য কোন কারণ, সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা বইপত্রে চোখে পড়ে না। রাখাইনদের অনেকে একসময় 'মারমা' হিসাবেও নিজেদের পরিচয় দিত বলে জানা যায়, যদিও সাম্প্রতিককালে তারা শুধু রাখাইন পরিচয়ই ব্যবহার করে। পক্ষান্তরে মারমারা কোনকালে রাখাইন পরিচয় ব্যবহার করেছে, এমন তথ্য পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রাখাইন শব্দটি ব্যুৎপত্তিগতভাবে 'আরাকান'-এর সাথে সম্পর্কিত, পক্ষান্তরে 'মারমা' শব্দটি সম্পর্কিত 'বার্মা' বা 'মায়ানমার'-এর সাথে। অর্থাৎ এই নাম দুইটি যথাক্রমে আরাকান ও মায়ানমারের সাথে সম্পর্ক নির্দেশ করে। (রাখাইন শব্দটি বাংলায় 'রাক্ষাইন' হিসাবেও অনেকে লিখে থাকেন এবং এটিকে বিভিন্ন সংস্কৃত বা পালি শব্দের সাথে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস চোখে পড়ে, তবে এ ধরনের ব্যাখ্যার কোন যথাযথ ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।) আরাকান বর্তমানে বার্মার একটি প্রদেশ হলেও একসময় তা ছিল একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। রাখাইনরা মনে করেন, আরাকান রাজ্য বার্মা কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার সময় তাদের পূর্বসূরীরা সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিল। এভাবে নিজেদের ইতিহাসকে কারা কিভাবে মনে রেখেছে বা দেখছে, তার উপর নির্ভর করেই সম্ভবতঃ মারমা ও রাখাইনদের স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে উঠেছে।

বাঙালীদের কাছে অবশ্য রাখাইন তথা মারমারা 'মগ' বলেই বেশী পরিচিত ছিল বেশ আগে থেকে। বাংলা ভাষায় 'মগের মুল্লুক' কথার অর্থই বলে দেয় কেন এই অভিধা রাখাইন বা মারমাদের কাছে আপত্তিকর হবে। ইতিহাসের পাঠ্যবইয়েও আমরা মগ (অর্থাৎ আরকানী) জলদস্যুদের কথা পড়ি। এসব জেনেশুনেই সমকালীন রাখাইন বা মারমাদের কেউকে 'মগ' নামে সম্বোধন করলে তা হবে নিঃসন্দেহে অপমানসূচক। এককালে সরকারী নথিপত্রে রাখাইন বা মারমাদের অনেকের নামের পেছনে অন্যরা 'মগ' পদবী জুড়ে দিয়েছিল বটে, তবে সাম্প্রতিককালে এই আরোপিত পরিচিতি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে। (উল্লেখ্য, চট্টগ্রামের বাঙালী বৌদ্ধ বা বড়ুয়াদেরও এককালে 'বড়ুয়া মগ' নামে অভিহিত করা হত। এমনকি নোয়াখালী অঞ্চলের লোকেরা এখনো গালি হিসাবে চট্টগ্রামের মানুষদের 'মগ' বলে সম্বোধন করে।)

১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে রাখাইনদের সংখ্যা ছিল ১৭,০০০-এর মত, কিন্তু রাখাইনদের নিজস্ব একটি সংগঠনের দাবী অনুযায়ী এদেশে তাদের জনসংখ্যা হল দেড় লাখ। তাদের সংখ্যা যাই হোক, উপকূলীয় এলাকার উল্লেখযোগ্য পর্যটন এলাকাসমূহে (কক্সবাজার, কুয়াকাটা প্রভৃতি) রাখাইনদের স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত উপস্থিতি সহজেই অন্যদের নজর কাড়ে। ধর্মীয়ভাবে বৌদ্ধ রাখাইনদের রয়েছে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, এবং প্রচলিত অর্থে তাদেরকে কোনভাবেই 'আদিম' হিসাবে গণ্য করা যায় না। তথাপি তাদের স্বাতন্ত্র্যের কারণে অনেকক্ষেত্রে তারা বিদ্রুপ-বিদ্বেষের শিকার হয়, যদিও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল যে কোন বাংলাদেশীই সহজেই বুঝবে যে রাখাইনদের উপস্থিতি সামাগ্রিকভাবে এদেশকে সমৃদ্ধ করেছে।

ধর্মীয়ভাবে বৌদ্ধ রাখাইনদের রয়েছে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, এবং প্রচলিত অর্থে তাদেরকে কোনভাবেই 'আদিম' হিসাবে গণ্য করা যায় না।... রাখাইনদের সাংস্কৃতিক ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের উপস্থিতি সামাগ্রিকভাবে এদেশকে সমৃদ্ধ করেছে।

ইতিহাস

বলা হয়ে থাকে রাখাইনরা দুইশতাধিক বছর আগে আরাকান থেকে এদেশে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। রাখাইনরা নিজেরাও তাই মনে করেন। তবে এক্ষেত্রে এটাও লক্ষ্য রাখা দরকার যে, চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে আরাকানী শাসন বা প্রভাব ছিল (চট্টগ্রামে মুগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে এ অঞ্চল কখনো কখনো ত্রিপুরা রাজ্যের মাণিক্য রাজাদের শাসনাধীনেও ছিল)। কাজেই রাখাইনদের অভিবাসনের যে সময়কালের কথা সচরাচর বলা হয়, তার বেশ আগে থেকেই তাদের পূর্বসূরীদের অনেকে বর্তমান কক্সবাজার-রামু-টেকনাফ প্রভৃতি অঞ্চলে ছিল বলে অনুমান করা যায়। তবে পটুয়াখালী অঞ্চলে রাখাইন বসতি গড়ে ওঠার সময়কাল হিসাবে কোন কোন প্রকাশিত বিবরণে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর কথা উল্লেখ করা হলেও এর পক্ষে সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য অনুসারে পটুয়াখালী অঞ্চলে রাখাইন বসতি গড়ে উঠেছিল অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে। তবে সংশ্লিষ্টদের অনেকে চট্টগ্রাম ও রামু অঞ্চল থেকে পটুয়াখালী অঞ্চলে এসেছিল। অবশ্য ওই সময় বার্মা কর্তৃক আরাকান আক্রান্ত হওয়ায় আরকান থেকে অনেক শরণার্থী চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে প্রথমে আশ্রয় নিয়েছিল। পটুয়াখালী অঞ্চলে এদেরই অনেকে পুনর্বাসিত হয় বলে ধারণা করা হয়। অন্যদিকে ১৭৮৪ সালে ১৫০ পরিবার নিয়ে গঠিত রাখাইনদের একটি বড়সড় দল ৫০টি নৌযানে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে সরাসরি আরাকান থেকে বর্তমান গলাচিপা থানার অন্তর্গত রাঙাবালি দ্বীপে এসে বসতি গড়েছিল, এমন বিবরণও পাওয়া যায়।

প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য অনুসারে পটুয়াখালী অঞ্চলে রাখাইন বসতি গড়ে উঠেছিল অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে। তবে সংশ্লিষ্টদের অনেকে চট্টগ্রাম ও রামু অঞ্চল থেকে পটুয়াখালী অঞ্চলে এসেছিল। অবশ্য ওই সময় বার্মা কর্তৃক আরাকান আক্রান্ত হওয়ায় আরকান থেকে অনেক শরণার্থী চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে প্রথমে আশ্রয় নিয়েছিল। পটুয়াখালী অঞ্চলে এদেরই অনেকে পুনর্বাসিত হয় বলে ধারণা করা হয়।

বর্তমান কক্সবাজার-পটুয়াখালী-বরগুনা অঞ্চলসমূহে যেভাবেই রাখাইনদের প্রথম আগমন ঘটে থাকুক না কেন, উপকূলীয় বনাঞ্চলের অনেক স্থানকে আবাদী ভূমিতে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে তারাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। পটুয়াখালী অঞ্চলে বনভূমি পরিস্কার করিয়ে চাষাবাদের সূচনা ঘটানোর লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকার রাখাইনদের ভূমি বন্দোবস্তি দানের ব্যবস্থা নিয়েছিল। এ লক্ষ্যে সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের একজন বিশেষ কর্মকর্তাও নিযুক্ত ছিল, তবে পাকিস্তান আমলে এই পদ বিলুপ্ত করা হয়। রাখাইনদের দৃষ্টিতে এই পদক্ষেপ তাদেরকে নিজেদের হাতে গড়ে তোলা আবাদী ভূমি থেকে ধীরে ধীরে উচ্ছেদের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। বাস্তবেও বিভিন্ন কারণে পাকিস্তান আমলে এদেশে রাখাইনদের সংখ্যা কমতে শুরু করেছিল বলে জানা যায়, তাদের অনেকে নানান্ প্রতিকূলতার মুখে দেশান্তরী হতে বাধ্য হয়। এই প্রক্রিয়া এখনো পুরোপুরি বন্ধ হয় নি বলেই প্রতীয়মান হয়।

আর্থসামাজিক অবস্থা

রাখাইনদের অধিকাংশই অর্থনৈতিকভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল, বিশেষ করে পটুয়াখালী-বরগুনা অঞ্চলে। কৃষি-নির্ভর রাখাইনদের অনেকেরই বিগত দশকগুলোতে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ভূমি হাতছাড়া হয়েছে, ফলে তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি ভঙ্গুর হয়ে গেছে। ভূমি হারানোর পাশাপাশি তাদের সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কারণে, সংখ্যাল্পতার কারণে, বিভিন্ন সময়ে তারা বৈষম্য ও হয়রানির শিকার হয়েছে। প্রতিবেশী বাঙালীদের অনেকে এখনো তাদের 'মগ' হিসাবে হেয় করে থাকে। এভাবে বৈরী একটি পরিমন্ডলেই অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তাদের মত রাখাইনরাও এদেশে বসবাস করছে। অবশ্য এমন নয় যে

রাখাইনদের অধিকাংশই অর্থনৈতিকভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল, বিশেষ করে পটুয়াখালী-বরগুনা অঞ্চলে।

প্রতিকুলতার মুখে তারা সবাই হতাশ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে রয়েছে। বরং নিজেদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরার জন্য, এবং সেগুলোর সমাধান খোঁজার লক্ষ্যে, তারা সংগঠন গড়ে তুলেছে।
রাখাইনদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত। কক্সবাজার শহরে রাখাইনদের পরিচালিত দোকান পাট চোখে পড়ে। অন্যত্রও, যেমন বান্দরবান শহরে, রাখাইনদের দোকান রয়েছে। তাদের অনেকে পাহাড়ীদের মধ্যে জনপ্রিয় 'নাপ্পি' নামে পরিচিত একধরনের শুটকি-মন্ড উৎপাদন ও বিপণনের সাথেও জড়িত। এছাড়া ঐতিহ্যগতভাবে রাখাইনদের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই নারীদের পরিচালিত তাঁত ছিল, যা দিয়ে পরিবারের বস্ত্রচাহিদা মেটানো হত। সূতার দাম বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কারণে এই শিল্প বর্তমানে হুমকির মুখে, তবে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হলে এর বিকাশ ও প্রসার সম্ভব বলে মনে করা হয়।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাখাইনদের জীবনে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। প্রথাগতভাবে রাখাইনদের অধিকাংশই নিজেদের ভাষায় লিখতে পড়তে পারত, এবং এখনো পারে, যার পেছনে তাদের 'কিয়ং' বা বৌদ্ধ-বিহার ভিত্তিক শিক্ষা-ব্যবস্থার ভূমিকা রয়েছে। তবে রাখাইনদের অনেকে জাতীয় শিক্ষাকার্যক্রমের আওতা-বহির্ভূত রয়ে গেছে। বিশেষ করে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম, তবে অল্পসংখ্যক যাঁরা রয়েছেন তাঁদের কেউ কেউ উচ্চ পদে চাকুরিতে নিয়োজিত রয়েছেন।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাখাইনদের জীবনে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। প্রথাগতভাবে রাখাইনদের অধিকাংশই নিজেদের ভাষায় লিখতে পড়তে পারত, এবং এখনো পারে, যার পেছনে তাদের 'কিয়ং' বা বৌদ্ধ-বিহার ভিত্তিক শিক্ষা-ব্যবস্থার ভূমিকা রয়েছে।

যেসব রাখাইনরা এদেশে রয়ে গেছে, সাংস্কৃতিকভাবে তারা নিজেদের উৎসভূমি হিসাবে আরাকান বা মায়ানমারকে চিহ্নিত করলেও এদেশের নাগরিক হিসাবে পূর্ণ মর্যাদা নিয়ে বসবাস করার জন্মগত অধিকার তাদের অবশ্যই রয়েছে, এবং এটা প্রত্যাশিত যে 'স্বদেশে পরবাসী' হিসাবে যেন তাদের জীবন কাটাতে না হয়, রাষ্ট্রীয়ভাবে তার সুব্যবস্থা করা হবে।

সারাংশ

উপকুলীয় এলাকায় কক্সবাজার-বরগুনা-পটুয়াখালী জেলাসমূহে রাখাইন জনগোষ্ঠীর বসবাস। রাখাইনদের অতীত ইতিহাস আরাকান তথা বার্মার (অধুনা মায়ানমার) সাথে সম্পৃক্ত। তবে এদেশে রাখাইনরা দুইশতাধিক বছর ধরে বসবাস করছে, এবং উপকূলীয় অঞ্চলসমূহে তারাই প্রথম আবাদী ভূমি গড়ে তুলেছিল। কৃষি ছাড়া রাখাইনদের অনেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথেও জড়িত। তবে ভূমি হাতছাড়া হওয়াসহ বিভিন্ন কারণে এদেশের রাখাইনরা আর্থসামাজিক চাপের মুখে রয়েছে, এবং বৈরী পারিপার্শ্বিকতার কারণে তাদের কিছু অংশ দেশান্তরীও হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাখাইনদের একটি সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে, যেটাকে লালন করা দরকার শুধু তাদের আত্মপরিচয়ের স্বার্থে নয়, বরং বাংলাদেশের জাতীয় ঐতিহ্যের সমৃদ্ধি ঘটানোর জন্যও।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন -

১। পটুয়াখালী, বরগুনা ও কক্সবাজার জেলাসমূহে কোন আদিবাসী জনগোষ্ঠী বাস করে ?

ক. চাকমা　　খ. মারমা

গ. সাঁওতাল　　ঘ. রাখাইন

২। রাখাইনরা মূলত কোন ধর্মাবলম্বী ?

ক. ইসলাম　　খ. হিন্দু

গ. বৌদ্ধ　　ঘ. খৃষ্টান

৩। রাখাইনদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কার ভূমিকা বেশী ?

ক. স্কুল　　খ. পরিবার

গ. কিয়ং　　ঘ. মিশনারী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। 'রাখাইন' ও 'মারমা' নামের ব্যুৎপত্তি আলোচনা করুন।

২। 'মগ' আখ্যাটি আপত্তিকর কেন?

৩। পটুয়াখালী অঞ্চলে কবে কিভাবে রাখাইনদের বসতি গড়ে উঠেছিল?

৪। রাখাইনদের জীবিকার উৎসসমূহ কি কি?

৫। 'কিয়ং' কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। রাখাইনদের পরিচয় ও ইতিহাস বর্ণনা করুন।

২। এদেশে রাখাইনদের সাম্প্রতিক অবস্থার বর্ণনায় 'স্বদেশে পরবাসী' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। কেন?